জরাসন্ধ

বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

কুমারী স্নস্মিতা চক্রবর্তী

কল্যাণীয়াস্থ

সূচীপত্র—

লেখকের অন্যান্য বই

লৌহকপাট, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব
লৌহকপাট চার খণ্ড একত্রে

তামসী
পাড়ি
মসিরেখা
ছায়াতীর
বন্যা
সপ্তবহ্নি
পরশমণি
তনু মন
দেহ শিল্পী
জায়গা আছে
এবাড়ি ওবাড়ি (নাটক)
ন্যায়দণ্ড
আশ্রয়
একুশ বছর
ছবি
মল্লিকা
পসারিণী
নমিতা
অপর্ণা
মানস কন্যা
সহচরী
মহাশ্বেতার জা

কিশোর সাহিত্য

রং চং
যম রাজার বিপদ
গল্প লেখা হল
মঞ্জরী

স্বীকৃতি

এক

অলক রায়ের সেদিনের কথাগুলো আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। মানুষটিও চোখের উপর ভাসছে। লম্বায় বোধহয় ছ-ফুটের কিছু বেশী। ছিপছিপে গড়ন। মাথার মাঝখানে একটি ছোট গোলাকার টাক, চারদিক ঘিরে রুক্ষ কোঁকড়ানো চুল। নাকটা খাঁড়ার মত। দুপাশে দুটি গভীরে বসানো চোখ, ইংরেজিতে যাকে বলে ডীপ-সীটেড্ আইজ। আকারে ছোট, বলতে গেলে অতবড় একটা দেহের পক্ষে নিতান্ত বেমানান। কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণ তাদের দৃষ্টি। কারো মুখের উপর পড়লে তার মনে হবে অন্তস্তল পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে গেল।

ভারী ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে এবং তার সঙ্গে মানানসই মোটা সিগার টানতে টানতে বলেছিলেন, আমি লিখি আমার নিজের জন্যে। নিজের চিন্তা-ভাবনা খেয়াল-খুশিগুলোকে ইচ্ছামত রূপ দিই। কেউ পড়ল কিনা, কিংবা পড়ে কারো ভাল লাগল কি মন্দ লাগল, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

কথাগুলোকে আমার দম্ভোক্তি বলে মনে হয়েছিল সেদিন। ফুটে না বললেও সেই সন্ধানী চোখ দুটো দিয়ে তিনি বোধহয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর পরের কথা থেকেই তা বোঝা গেল—তুমি হয়তো ভাবছ, এটা আমার অহঙ্কার। না; একে বলতে পার আত্মপ্রত্যয়, প্রত্যেক লেখকেরই যা থাকা দরকার। তা না-হলে তাকে বলব হ্যাক্-রাইটার, পাঠকের ভাড়াটে লেখক।

এবার আর প্রতিবাদ না করে পারিনি, যদিও তার স্বর অতি ক্ষীণ, অতবড় প্রতিভার সামনে আমার মত একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিকপত্রের অনুগ্রহপ্রার্থী গল্পলেখকের কণ্ঠে যতটুকু সম্ভব। বলেছিলাম, কিন্তু আমার লেখা যদি কেউ না পড়ে তার সার্থকতা কোথায়? কী পেলাম আমি তার থেকে?

পেলাম আনন্দ, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন অলকবাবু, সৃষ্টির আনন্দ, আমার সৃষ্টি থেকে যা স্বতঃ-উৎসারিত।

তাতে মন ভরে?

কেন ভরবে না? তার চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী আছে লেখকের জীবনে?

এ যখনকার কথা, অলক রায়ের প্রতিভা তার আগেই বাংলাদেশের বিদগ্ধ পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করেছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক তাকে বড় একটা চেনে না। প্রকাশকের বিজ্ঞাপন দেখে যে-সব পাবলিক লাইব্রেরী তাঁর দু-চারখানা উপন্যাস সংগ্রহ করেছিল, তারা আর অগ্রসর হয়নি। বইগুলো প্রায় নতুনই রয়ে গেছে আলমারির কোণে। সুতরাং তার পরে যা লিখেছেন, স্বভাবতই সেগুলোর দিকে তারা আকৃষ্ট হয়নি।

লাইব্রেরীর বাইরেও কিছু বই কাটে। তার বেশির ভাগ বোধহয় বিয়ের উপহার। সে-সব ক্রেতাদের প্রধান লক্ষ্য চারটি—বইয়ের নাম, দাম, মলাট এবং কিছুটা বিষয়-বস্তু। নামের মধ্যে তারা খোঁজে একটি মিষ্টি রোমান্সের সুর, ধ্বনি-মাধুর্য, নয়তো কোনো শুভসূচক ইঙ্গিত। তারপর দেখে দামটা মাঝারি ধরনের কিনা, ইংরেজিতে যাকে বলে মডারেট। একাধিক বই দিতে হবে তো, এবং উপহার-দাতারা অনেকেই সাধারণ স্তরের ছাত্র-ছাত্রী কিংবা ক্ষীণ-পকেট চাকরিজীবী।

সুদৃশ্য রঙীন মলাট, বিশেষ করে তার উপরে নানা ভঙ্গিমায় নারীচিত্র—উপহার নির্বাচনের একটা প্রধান অঙ্গ। ভিতরকার বস্তুটিও কম বিবেচ্য নয়। সকলের চেয়ে বেশি চলে প্রেম; ব্যর্থ নয়,

সার্থক প্রেম, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার সুখ-মিলনে যার পরিণতি। পরের স্থান নেবে কোনো মধুর ঘরোয়া গল্প কিংবা ঐ জাতীয় কোনো ভাবোচ্ছ্বাসভরা রোমান্টিক কাহিনী।

বিয়ের বাজারে 'অভিশপ্ত' কিংবা 'লগ্ন-ভ্রষ্টার' চেয়ে অনেক বেশি ক্রেতা আকর্ষণ করবে 'স্বপ্নসায়র', 'নূপুর-নিক্কণ' কিংবা 'মধুর লগন'। এখানে পাঁচ টাকার কাছে হার হবে বারো টাকার, এবং নামজাদা সাময়িক পত্রের বাঁধা সমালোচক ও কিছু কিছু সাহিত্য-কারবারী বাংলার অধ্যাপক যে-সব উপন্যাসকে 'বাস্তবধর্মী', 'জীবনাশ্রয়ী', 'যুগমানসের দর্পণ', 'গভীর মননশীল' ইত্যাদি কটমট বিশেষণে ভূষিত করে থাকেন সেগুলোকে পিছনে ঠেলে এগিয়ে আসবে এমন কতগুলো ঝকঝকে বই, তাঁদের ভাষায় যারা 'জ'লো', 'মেলোড্রামাটিক', 'অসার', 'অবাস্তব' কিংবা 'সেন্টিমেণ্টাল'।

তাদের ভিতর থেকেই কয়েকখানা বেছে নিয়ে যাবে বর বা কনের বন্ধুরা, স্বচ্ছ কাগজে জড়িয়ে, লাল ফিতেয় বেঁধে তুলে দেবে একরাত্রির মত লব্ধসিংহাসনা নববধূর হাতে, এবং তার কাছ থেকে লুফে নেবে তার সখীরা। তারপর এক হাত থেকে আরেক হাতে ফিরবে সেই বই। তার মধ্যে হয়তো এমন একটি জগতের ছবি আছে, একমাত্র ঐ লেখকের মনোভূমি ছাড়া আর কোথাও যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা কি তার পাঠক-পাঠিকারা জানে না? জানে। তবু তন্ময় হয়ে ডুবে যাবে নিছক কল্পনার উপর গড়ে তোলা সেই সব মোহময় ছবির মধ্যে, যেখানে নিউ আলিপুরের অজস্র বিলাসময় ড্রইংরুমে বসে কোনো এক লক্ষপতির সুন্দরী কন্যার কানে কানে প্রেম নিবেদন করছে এক 'দীন হীন' উদ্বাস্তু যুবক, কিংবা টালিগঞ্জের দূর প্রান্তে টিনের ঘরের ভাঙা জানালায় কোনো সওদাগরী অফিসের টাইপরাইটার-চালিকা একটি কালো মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে বালিগঞ্জবাসী অভিজাত বনেদী ঘরের একমাত্র তরুণ বংশধর।

এই বইয়ের যারা পাঠক-পাঠিকা তারা জানে ঐ জগৎটিতে তারা কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না। তাই সহৃদয় লেখকের হাত ধরে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, কয়েক মুহূর্ত সেই অপ্রাপনীয় কল্পলোকের শোভা ঐশ্বর্য এবং মধুরিমার স্বাদ নেয়। এও এক ধরনের জীবনোপভোগ।

আরো কিছু লোক বই কেনে। তারা ডেইলি প্যাসেঞ্জার, সরকারী এবং সওদাগরী অফিসের বড়, মেঝো, সেঝো কিংবা ছোট কেরানীর দল। জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে হেড-ক্লার্ক। অর্থাৎ 'বাবু' পর্যায়ের লোক। ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ির একটি নির্দিষ্ট কোণ দখল করে একদল যেমন মাঝখানে একটা ঝাড়ন কিংবা চাদর বিছিয়ে তাস নিয়ে বসে, আরেক দল তেমনি এখানে ওখানে ছিটকে পড়ে খুলে বসে কোনো হাল আমলের চটি উপন্যাস। পথটুকু পার করে দেবার সঙ্গী। সহজ, কোমল, হালকা, মধুর সুখপাঠ্য গল্প, যার রস পেতে হলে আখের মত দাঁত বসাতে হয় না, আঙুর, কমলা, বাতাবির মত চুষে খেলেই চলে। তার মধ্যে 'জীবনবোধ' বা 'যুগমানসের' বালাই নেই, 'মনীষাদীপ্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের' কচকচিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আর বই কেনেন কর্মব্যস্ত সংসারের গৃহিণীরা। ঝি-চাকর, বয়-বাবুর্চি পরিবৃত উঁচুমহলের উল-কাঁটা-সর্বস্ব গৃহিণীদের বাজেটেও বইয়ের একটা ক্ষুদ্র স্থান আছে। সেগুলো প্রায়ই ইংরেজি। তার এক পাশে দুচারখানা প্রসিদ্ধ লেখকের বাংলা গ্রন্থও দেখা যায়। ড্রইংরুমে কিংবা শয়নকক্ষে সুদৃশ্য বুককেস-এ সাজানো থাকে। 'সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা'। শুধু 'ভৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে, যত্ন পুরা মাত্রা'।

কিন্তু খেটে-খাওয়া গিন্নীরা বই কেনেন পড়বার জন্যে। সারা সকালটা রান্না-বান্না, ঘর-দোরের কাজ নিয়ে হিমসিম খাবার পর দুটো ভাত মুখে দিয়ে একটু গড়িয়ে নেবার অবসর যখন আসে, তখন হাতে কিছু চাই। এমন একটি গল্প, যার পিছনে হোঁচট

খেতে খেতে চলতে হয় না, যে নিজে থেকেই টেনে নিয়ে যায়। বেশি দূর নয়, কয়েক পাতা, চোখদুটো যতক্ষণ না বুজে আসে।

অলক রায় অবশ্যই এদের কারো জন্যে লেখেননি। বিয়ের উপহার, ডেইলি প্যাসেঞ্জারের সঙ্গী, কিংবা ক্লান্ত গৃহিণীর নিদ্রাকর্ষণের টনিক—এই জাতীয় কোনো স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে তাঁর বই, এমন দুর্ঘটনা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। আসলে তার সম্ভাবনাও ছিল না। তাঁর যারা পাঠক (সংখ্যায় অতি মুষ্টিমেয় এবং নিজেদের কাছে বুদ্ধিজীবী, ও অপরের কাছে স্নব বলে পরিচিত)—তাঁরা বলতেন, অলক রায়ের লেখা ইজিচেয়ারে বসে পড়বার জিনিস নয়, তার প্রতিটি লাইন পড়তে পড়তে ভাবতে হয় এবং ভাবতে ভাবতে পড়তে হয়। তাঁদের মধ্যে একজন কোনো একটি সাময়িক পত্রে (যা শুরুতে ছিল মাসিক, পরে হল ত্রৈমাসিক এবং আরো পরে ষান্মাষিকে গিয়ে দাঁড়াল) অলক রায়ের দু-একখানা উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেটা নাকি মূল রচনার চেয়েও দুর্বোধ্য। গ্রন্থকার নিজে অবশ্য তা পড়েননি, তাঁর লেখা সম্বন্ধে পাঠক বা সমালোচকের মতামত জানবার কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। অন্য কেউ কেউ পড়েছিলেন। তাদেরই একজনের মন্তব্য তাঁর কানে গিয়েছিল—'অতি উঁচু দরের রিভিউ, একটু হয়তো অস্পষ্ট। তবে অলক রায়ের প্রতিভার ওর চেয়ে স্পষ্ট পরিচয় বোধহয় সম্ভব নয়।'

শুনে খুশী হয়েছিলেন অলকবাবু। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কেও ঐ ধরনের উক্তি প্রচলিত আছে, তিনি জানতেন। একবার এক অর্বাচীন বলেও ফেলেছিল তাঁর মুখের উপর—আপনার লেখা মোটেই বোঝা যায় না।

অলকবাবু মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, বোঝা কি নিজে থেকে যায়? তাকে মাথায় করে বয়ে নিতে হয়। ঐ মাথাটাই হল আসল। ওটা না হলে তো চলবে না।

তাঁর উপন্যাসের রিভিউ সম্বন্ধে যে উক্তিটি শুনে তিনি মনে মনে খুশী হয়েছিলেন, সেটি কার, প্রথমটা জানতে পারেন নি। শুনেছিলেন, তিনি একজন মহিলা। সেই জন্যেই হয়তো তার সম্বন্ধে আরো কিছুটা জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কৌতূহল-নিবৃত্তির কোনো চেষ্টা করেন নি।

অলক রায়ের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয়। আপনা থেকেই পরিচয় হয়ে গেল। অনেকটা আকস্মিকভাবে বলা চলে।

দক্ষিণ-কলকাতার নতুন-গড়ে-ওঠা অভিজাত অঞ্চলে একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান। সদস্যরাও অভিজাত, তবে স্থূল বা প্রচলিত অর্থে নয়। অন্ততঃ সকলের বেলায় সে-কথা বলা চলে না। স্বামীর চাকরি, বাড়ি, গাড়ি, কিংবা নিজের শাড়ি-গহনা দিয়ে যাদের পরিচয় এমন ক'জন যেমন আছেন, (যদিও এক্ষেত্রে তাঁরা সেভাবে পরিচিত হতে চান না) তেমন আরেকটা সংখ্যা আছে, যাদের আভিজাত্যটা মানসিক, অর্থাৎ ইনটেলেকচুয়াল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু ডিগ্রি আছে, এবং সেটি অর্জন করতে গিয়ে, কফি হাউসের মিশ্র সমাজে যে অতি-আধুনিক চিন্তাধারার প্রবাহ চলে, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে; কলেজ ইউনিয়নের কার্যকলাপের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন কেউ কেউ। কর্মজীবনে কেউ শিক্ষিকা (স্কুলে এবং কলেজে) কেউ সরকারী কিংবা সওদাগরী অফিসে দশটা-পাঁচটা করেন, কেউ আবার মনোমত কোনো পূর্ব-সহচরকে জুটিয়ে নিয়ে সংসার পেতেছেন, বাজার করেন, ঘর-দোর সাজান, রেডিও শোনেন এবং সপ্তাহান্তে চৌরঙ্গীপাড়ায় ছবি দেখতে যান। তাঁদের মধ্যে মা-ও হয়েছেন দু-একজন, কিন্তু মাতৃত্বের পরিধি ঐ জন্মদান পর্যন্ত। পরের অংশে প্রথম অঙ্ক জুড়ে আছে আয়া, সেই প্রাচীন যুগের চেড়ীর আধুনিক সংস্করণ, দ্বিতীয় অঙ্কের ভূমিকা নেয় নার্সারি স্কুল, যেটা স্কুল তো নয়ই, নার্সারি অর্থাৎ শিশু পালনের ক-খ নিয়েও মাথা ঘামায় না।

এঁরা কয়েকজন মিলে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। মাসান্তে

মিলিত হতেন এঁদের মধ্যে যাঁরা সঙ্গতিপন্ন সাধারণতঃ তাঁদের বাড়ি। স্থান-সঙ্কুলানের প্রশ্ন ছিল, তার সঙ্গে জলযোগের ব্যাপারটাও অবশ্য বিবেচ্য। ওটা একটু ব্যাপক আকারে হত, এবং তার আয়োজন করতেন, সভা যেখানে বসত সেই বাড়ির গৃহিণী। উদ্দেশ্য, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা, এবং সেই উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে এঁরা কোনো সাহিত্যিক কিংবা সংস্কৃতিবান ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে আসতেন। তাঁদেরই ডাকতেন—বিদগ্ধ এবং বুদ্ধিজীবী সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠবান, 'জনপ্রিয়' মার্কা যাত্রার হট্টগোলে নেমে যাননি।

এইখানে একদিন অলক রায়ের ডাক পড়ল। ডাকতে এলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা বিশাখা মিত্র, কোনো মহিলা কলেজে দর্শনের অধ্যাপিকা, সঙ্গে তাঁর এক ছাত্রী, মঞ্জুলা। মঞ্জুলা অলক রায়ের বই পড়ে না। শিশির গুপ্ত, অমল মিত্র প্রমুখ 'মিষ্টি' (মিষ্টিক নয়) লেখকদের নিয়ে তার যে একটি জগৎ আছে, অলক রায় তার অনেক ঊর্ধ্বে। সে এসেছিল অন্য কারণে। তার ধারণা, সাহিত্যিকরা চেহারায় মানুষ হলেও আসলে এক ধরনের আজব জীব। তাদের দু-একজনকে দূর থেকে বক্তৃতা করতে শুনেছে, কাছ থেকে কথাবার্তা বলতে দেখেনি। কী কথা বলেন তাঁরা, কেমন করে বলেন, কী রকম ঘরে কীভাবে থাকেন, ওঠেন বসেন, দেখবার ভীষণ ইচ্ছা। এমনি একজন জলজ্যান্ত সাহিত্যিককে সামনের উপর দেখতে পাবে, মুখোমুখি বসে শুনতে পাবে তাঁর অদ্ভুত কথা (বইতে যা লেখেন তাঁরা), এত বড় সুযোগ সে ছাড়তে পারেনি। ভাবতে গিয়েই রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছিল তার মনে।

বিশাখারও সঙ্গে কেউ একজন চাই যে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবে, দুটি প্রশস্তিসূচক কথা বলবে তার সম্বন্ধে, যা নিজের মুখে বলতে বাধে। সহ-সদস্যা কাউকে নিয়ে আসতে পারতেন, ভরসা করেননি। কে জানে, সে হয় নিজেই নজরে পড়বার চেষ্টা করবে, এই সুযোগে নিজের সম্বন্ধে একটা বেটার ইম্প্রেশন নিয়ে

ফিরবে ওঁর কাছ থেকে। এখানে কেউ বন্ধু নয়, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। মঞ্জুলার কথা আলাদা। সে আর যাই করুক, বিশাখা মিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে না। বয়সের গুণে তাঁর চেয়ে বেশি আকর্ষণ টেনে নেবে? পুরুষের চোখ তো! বলা যায় না। ছাত্রীর দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন বিশাখা, তারপর দৃষ্টি ফেরালেন নিজের দেহে। ওদিকে ভরা জোয়ার, এদিকে ভাঁটার টান শুরু হয়ে গেছে। একটা সান্ত্বনা, মেয়েটার রূপ নেই, সেদিক দিয়ে তিনি ওর চেয়ে এগিয়ে আছেন। অতবড় লেখকের দৃষ্টি এখানে বিভ্রান্ত হবে বলে মনে হয় না। তবু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। তিনি তো জানেন, লেখকই হোক আর বৈজ্ঞানিকই হোক, পুরুষের কাছে নারীর আসল রূপ তার যৌবন। এই মর্মান্তিক সত্যকে অস্বীকার করবেন কেমন করে?

একবার ভাবলেন, দরকার নেই, মঞ্জুলা থাক, তিনি একাই যাবেন।

তারপর মনে হল, অলক রায় অন্য জাতের পুরুষ। তিনি 'বুদ্ধিজীবী', ইণ্টেলেকচুয়াল রাইটার। তাঁর সম্বন্ধে এসব কথা মনে করা অশোভন, এতে তাঁর উপরে অবিচার করা হবে। তিনি নিশ্চয়ই এই দুর্বলতার ঊর্ধ্বে।

তাছাড়া, নিজের দিক থেকে দেখতে গিয়ে বিশাখার মনে হল তাঁর এই আশঙ্কার মূলে বোধহয় একটা ডিফীটিস্ট মনোভাব কাজ করছে! হেরে যাবার ভয়। অধ্যাপিকার অভিমানে ঘা লাগল। ছাত্রীর কাছে হার মানবেন! ঐ কালো মেয়েটার কাছে পরাজয় ঘটবে বিশাখা মিত্রের!

অলক রায় থাকতেন মধ্য কলকাতায়। হ্যারিসন রোডের কাছে আঁকা-বাঁকা সরু গলির মধ্যে অনেককালের পুরনো একটা বাড়ির দোতলায়। অন্ধকার নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। দুখানা ঘর, সামনে একফালি ছাত। তার ওপাশটা জুড়ে গোটা কয়েক বিবর্ণ টব,

ওঁর নয়, এ বাড়িতে আগে যারা ছিল তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি একটাতে টিন টিন করছে একটা ফণীমনসার গাছ, বাকীগুলোতেও একসময়ে ফুল-টুল লাগানো হত বোঝা যায়, এখন খালি পড়ে আছে, শুকনো ফাট-ধরা মাটিতে একগাছা ঘাস পর্যন্ত নেই।

অলকবাবুর এক প্রকাশক বন্ধু নতুন-গড়ে-ওঠা দক্ষিণ অঞ্চলে শোভন পরিবেশে একটি সুদৃশ্য ফ্ল্যাট তার জন্যে সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু উনি সেটা নেননি। কারণ যা দেখিয়েছিলেন, তার মধ্যেও তাঁর অসামান্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। বলেছিলেন, কাককে আমি তার আসল রূপেই দেখতে চাই। ময়ূরপুচ্ছ জড়ানো নকল কাকের ওপর আমার কোনো মোহ নেই।...কলকাতায় যখন আছি, কলকাতাতেই থাকব।

বন্ধু তর্ক তুলতে পারতেন, বালিগঞ্জ কি কলকাতা নয়? বৃথা হবে বলেই তোলেন নি।

অলকবাবুর একমাত্র বাহন অর্জুন তাঁর 'দেশের' সংগ্রহ। সার্থক নাম দিয়েছিল তার বাপ-মা। সাক্ষাৎ সব্যসাচী। একার সংসার হলেও কাজ কম ছিল না। তার মধ্যে অকাজের সংখ্যাটাই বড়, তার খেয়ালী মনিব যা অনবরত সৃষ্টি করতেন। দুটি হাত সমানে চালিয়ে অর্জুন সব ঠিক রাখত, কোথাও কোন ফাক পড়তে দিত না।

মনিবের মত ভৃত্যেরও আমার উপর একটি স্নেহদৃষ্টি ছিল। মাঝে মাঝে দু একটা সুখ-দুঃখের কথা বলত আমার সঙ্গে। তার কাছেই শুনেছিলাম, মেদিনীপুরের কোনো গ্রামে কিছু ধানজমি আছে অলকবাবুর। বাবা নেই, লোকজনের সাহায্যে মা সেগুলো দেখা-শুনো করেন এবং মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন ছেলের জন্যে। তাতেই চলে যায় কোনোরকমে।

আমি প্রতিবাদ করলাম, কেন, বই থেকেও তো—

কথাটা শেষ করতে দিল না অর্জুন। মাঝপথেই মৃদু হেসে প্রস্থান করল।

একদিন, সবে বর্ষা শুরু হয়েছে কলকাতায়, তাঁর ছোট্ট ছাতটিতে

পায়চারি করতে করতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন অলকবাবু। অর্জুন বাইরে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বললাম, টবগুলোকে সার টার দিয়ে তৈরি করে রেখো তো অর্জুন। কাল আমি ক'টা ফুলের চারা এনে দেব।

অর্জুন তার মনিবের দিকে তাকাল। তিনি হেসে বললেন, ফুল কী হবে? ঐ তো বেশ আছে।

আমার বিস্মিত চোখের দিকে চেয়ে যোগ করলেন, ঐ শূন্য টবের শুকনো রুক্ষ মাটি, ওর মধ্যে জীবনের যে সত্য আছে, ফুল তাকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সে শুধু আবরণ, অলঙ্কার। ঐ ক্যাকটাসটা বরং মনে করিয়ে দেয় জীবনের আসল এবং চিরন্তন রূপ কী। তাই ছাখ না, ফুল গাছগুলো মরে গেলেও ওটা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

মনে পড়ল, এই ধরনের উক্তি বোধহয় ওঁর কোনো উপন্যাসের নায়কের মুখে শুনেছি। এইখানেই মননশীল লেখকের পরিচয়।

বিশাখা অনেক খুঁজে-পেতে বাড়িটা বের করলেন এবং অতি সন্তর্পণে শাড়ি বাঁচিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন উপরে। চিঠি লিখে তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করা ছিল। অলকবাবু উঠে এসে অভ্যর্থনা করে বসালেন ওদের। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিশাখার প্রথম কথা হল,—এইখানে থাকেন আপনি! বলা বাহুল্য, তার মধ্যে একটি গভীর বিস্ময়ের সুর। উত্তরে শুধু একটু হাসলেন অলকবাবু। এর পরেও আবার যখন বাড়ির কথাই তুললেন বিশাখা, তার সঙ্গে এই পুরনো ঘিঞ্জি অঞ্চল, এই সরু রাস্তা, এই পরিবেশ—অলকবাবু বললেন, মাপ করবেন, আপনি কি আমার বাসস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

বিশাখা একটু অপ্রস্তুত হলেও আশ্চর্য হলেন না। এই জাতীয় রূঢ় উক্তিই যেন এঁর মুখে মানায়। সাধারণ মানুষের মত অলক

রায় দুটি মহিলার সামনে বিনয়ে বিগলিত হয়ে যাবেন, এটা আশা করা যায় না।

মঞ্জুলার ভূমিকা ছিল সামান্য একটু মুখবন্ধ,—বিশাখা মিত্র ব্যক্তিটি কে এবং কী সেই সম্বন্ধে দু-একটি কথা, যার সূত্র ধরে তিনি খানিকটা আত্মবিস্তার করতে পারেন। সেই ইঙ্গিত করলেন ছাত্রীকে, প্রথমে চোখ টিপে, তারপর তার হাতেও একটু চাপ দিলেন। কিন্তু অতবড় একজন সাহিত্যিকের (শুধু নামে নয়, আকারেও) অত কাছে বসে মঞ্জুলার মাথার ভিতরে সাজানো কথাগুলো সব ওলট-পালট হয়ে গেল। কয়েকবার ঢোক গিলেও তাদের বাইরে আনা গেল না। অগত্যা বিশাখাই ছাত্রীর কাজ সংক্ষেপে সেরে নিয়ে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন। অলকবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, আপনারা কি আমার বই পড়েন?

প্রশ্নটা শুনেই হঠাৎ হকচকিয়ে গেলেন বিশাখা। প্রশ্নের সঙ্গে দুটি ক্ষুদ্র চক্ষু থেকে যে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ধারালো ছুরির ফলার মত তাঁর মুখে এসে পড়ল, বিশেষ করে সেই দিকে চেয়ে মিথ্যা কথাটা বলতে পারলেন না, আমতা আমতা করে বললেন, দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, এখনো ভালো করে পড়বার সুযোগ করে উঠতে পারিনি। আপনার বই তো যখন তখন যেমন তেমন করে পড়া যায় না। তার জন্যে একটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার। সেটি কিছুটা সংগ্রহ করতে পেরেছি, সম্প্রতি একটি রিভিউ পড়ে।

'রিভিউ'টি পড়ে তাঁর কি মনে হয়েছিল যখন জানালেন, অলকবাবুর মনে পড়ল ঠিক এই কথাগুলোই তিনি কিছুদিন আগে শুনেছেন। যে বন্ধুটির মুখ থেকে শুনেছেন তার নামটাও বেরিয়ে পড়ল। বোঝা গেল এই 'মহিলাটি'র কথাই বলেছিলেন তিনি।

অলক রায় এবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর অতিথির দিকে। তার মধ্যে প্রসন্নতার আভাস। এরকম একজন বিদগ্ধ পাঠিকাও অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর রচনা সহজপাঠ্য নয়, যেমন তেমন করে পড়া যায় না, তাই অন্যের আলোচনার আলোকে তাকে আয়ত্ত

করবার চেষ্টা করছেন। তার মধ্যে একটি গভীর নিষ্ঠার পরিচয় আছে।

বিশাখার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন অলকবাবু। তারপর মঞ্জুলার দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন, তুমি তো কিছুই বললে না?

উত্তরটা বিশাখাই দিলেন, ও আমার ছাত্রী, আপনাকে দেখতে এসেছে। অর্থাৎ, ওর আর বলবার কী থাকতে পারে?

কিন্তু মঞ্জুলারও কিছু বলবার ছিল, এবং বলে ফেলল—আচ্ছা, আপনার বই সিনেমা হয় না?

সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীকে ধমকে উঠলেন বিশাখা, কী বলছ যা-তা!

অলকবাবু কিছু বললেন না। সিগারেট টানছিলেন, টানতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে শুধু একবার হাসলেন। সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি। অর্থাৎ, ছেলেমানুষ; বলছে, বলুক। এরা তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত নয়। এদের জন্যে তো তিনি লেখেন না।

দুই

বিশাখা মিত্র যেদিন বিশাখা রায় বলে কলেজের মাইনের খাতায় সই করলেন এবং খবরটা নানা মহলে ছড়িয়ে পড়ল, তা নিয়ে অনেকে অনেক গবেষণা করেছিল। কারো মতে এটা পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল্ লাভ অ্যাফেয়ার, যা কোনো বয়সের সীমারেখা মেনে চলে না, বারো থেকে বাহান্ন সকলের জীবনেই আসতে পারে। কেউ বলেছিল, সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া প্ল্যানড্ অ্যাফেয়ার। দুপক্ষই ভেবে-চিন্তে, সব দিক হিসাব-নিকাশ করে ম্যারেজ-রেজিস্টারে সই দিয়েছে। উভয় তরফেই লাভ (বাংলা শব্দ), বিশাখার দিকে স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের অংশ বেশী, অলক রায়ের ঠিক উলটো, বেশির ভাগই স্থূল, যাকে বলে মেটিরিয়াল গেন।

আমি এর কোনো দলেই নই। যা ঘটল তাই নিয়ে আমার

কারবার, তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমি দেখলাম অলক রায়ের প্রতিভা বিকাশের একটা পথ খুলে গেল। বিশাখার মত তাঁর সাহিত্যের একজন মননশীলা অনুরাগিনী সঙ্গিনী হয়ে এলেন তাঁর জীবনে। এ সাহচর্য তাঁর সৃষ্টির সহায়ক হবে।

অর্জুন খুব খুশী। তার কারণ আলাদা। কিছুকাল আগে অলকবাবুর মা মারা গেছেন। তারপর থেকেই তাঁর ধানজমিতে অজন্মা শুরু হয়েছে, বরাদ্দ অর্থের অঙ্কটা দ্রুত নেমে আসছে। এদিকে বই-পাড়া থেকে যে 'বাবুরা' আসত, তারাও বেশ কিছুদিন এদিকটা আর মাড়ায় না। মনিবের সিগারের খরচ বেড়ে গিয়েছিল। ইদানীং কলমের বদলে ওটাই বেশী দেখা যাচ্ছিল তাঁর হাতে। ভাবনায় পড়েছিল অর্জুন। 'দিদিমণি' এসে সংসারের হাল ফিরিয়ে দিলেন। বিয়ের কিছুদিন পরেই 'আদি ও অকৃত্রিম উত্তর কলকাতার' বনেদী পাড়া ছেড়ে অর্বাচীন দক্ষিণের হঠাৎ-ফেঁপে-ওঠা চকমকে অঞ্চলে চটকদার ফ্ল্যাটে এসে উঠলেন অলক রায়। স্বেচ্ছায় বা খুশী মনে যে আসেন নি, তাঁকে জিজ্ঞাসা না-করেও বলা যায়। আমি তো তাঁর মন জানি। একদিন কোনো একটা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, একটা পাখির কাছে বাসা আর খাঁচায় যে তফাত, আমার কাছে এই বাড়িটা আর তোমাদের ঐ সব ফ্ল্যাটে সেই তফাত। এখানে বসে আমার মন স্বচ্ছন্দে ডানা মেলতে পারে, ওখানে গেলে মনে হয় কে যেন আমাকে ধরে-বেঁধে বন্দী করে রেখেছে।

সেই খাঁচাতেই এসে উঠতে হল। বিশাখা বললেন, লেখার জন্যে সকলের আগে চাই মনোমত পরিবেশ, তোমার সেই অন্ধকূপের চেয়ে এই খোলামেলা, আলো-হাওয়া ভালো লাগছে না?

অলক রায় মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ লাগছে। বললেন না, সকলের মন সমান নয়, সকলের সব জিনিস ভালো লাগে না। বলবার উপায় ছিল না। বিশাখার কলেজ এই দিকে। হ্যারিসন রোড থেকে

বাস-এ ঝুলতে ঝুলতে আসা চলে না। তাছাড়া মাস মাস কয়েকটা টাকাও বেঁচে গেল। বর্তমানে সে সাশ্রয়টুকুর দাম অনেক।

বিশাখার বন্ধুদের মধ্যে তাঁর বিদগ্ধ পাঠক সমাজের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পেলেন অলকবাবু। অভ্যর্থনার অভাব হল না। সৌজন্য, শালীনতার সঙ্গে শ্রদ্ধাও পেলেন। কিন্তু এই প্রথম টের পেলেন শ্রদ্ধাটা অনেক ক্ষেত্রেই নিরালম্ব। তার পিছনে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে অবগতি অতি সামান্য। অর্থাৎ,—'আসুন, আমার কত বড় সৌভাগ্য যে আপনার মত অতবড় সাহিত্যিকের পায়ের ধুলো পড়ল আমার বাড়ি! কী চমৎকার যে লেখেন আপনি! তবে জানেন, কাজকম্ম নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয়, পড়িনি বিশেষ কিছু।'

আরেকটা সত্য উপলব্ধি করলেন অলকবাবু। এ সমাজে অন্যান্য বহু ফ্যাশনের মত 'অলক রায়ও' একটা ফ্যাশন। সে-সব ফ্যাশন যারা যোগায়, যেমন শাড়ি-জুয়েলারি-ঘড়ি-ফার্নিচারের দোকানদার, তাদের উপর এঁদের যেমন একটি পেট্রন-সুলভ অনুকম্পা আছে, অলক রায় নামক ব্যক্তিটির প্রতিও সেই মনোভাব। যাকে তিনি 'শ্রদ্ধা' মনে করে গোড়াতে পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন, সেটা আসলে তারই মুখোশ-পরা মনোরম রূপ। অনেকটা যেন দামী ও মোলায়েম দস্তানাপরা হাতের পিঠ চাপড়ানো।

এবার অনেকদিন পরে গেলাম তাঁর নতুন ফ্ল্যাটে। বিশাখা ছিলেন না। এর আগে যখনই গিয়েছি, লক্ষ্য করেছি নিজের মধ্যেই যেন নিমগ্ন হয়ে আছেন অলকবাবু। যে স্নিগ্ধ হাসিটি আমাকে সস্নেহ আহ্বান জানাত, তার মধ্যেও একটি নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির আভাস পেতাম। এই প্রথম দেখলাম, অলক রায়ের মুখে চিন্তার ছায়া। লেখকের চিন্তা নয়, সেটা আমি চিনি। এর জাত আলাদা। বেশি কথা হল না। তার মধ্যে একটি যা শুনলাম, তাঁর কাছ থেকে একেবারে নতুন এবং অপ্রত্যাশিত।

কি সত্রে যেন এমন একজন লেখকের কথা এসে পড়েছিল, যিনি

সাধারণ পাঠকের চাহিদা বুঝে লেখেন। তাঁর সম্বন্ধে আমি 'জনপ্রিয়' শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম, এবং বোধহয় কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে। অলকবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বহুজনের চাহিদা মেটাতে পারলেই জনপ্রিয় হওয়া যায় না। তার জন্যে জনমানসের গভীরে ঢুকবার চাবিটি আয়ত্ত করতে হবে।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। এই কিছুদিন আগে 'জন' শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়েও তাঁর চোখে-মুখে অবজ্ঞার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখেছি। স্পষ্টভাষায় বলতে শুনেছি, শক্তিমান লেখকের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ জনপ্রিয়তার প্রলোভন। ঐ খপ্পরে একবার যে পড়েছে তার আর রক্ষে নেই। সে গেল।

আর আজ এ কী শুনছি!

কিছুক্ষণ চুপ করে দূরে মাঠের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, লেখক তার সৃষ্টির ভিতরে যে আনন্দ পায়, সেটা অনেকটা খোলা পাত্রে রাখা কর্পূরের মত। বড় তাড়াতাড়ি উবে যায়। তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে উপরে একটা আচ্ছাদন দরকার। সেই আচ্ছাদন হল পাঠকের স্বীকৃতি।

মনে পড়ল একদিন ঠিক এর উলটো কথাই শুনেছিলাম ওঁর মুখে। 'সৃষ্টির আনন্দই লেখকের মন ভরে রাখে। পাঠক সেটা নিল কিনা, কিংবা কি ভাবে নিল সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, ইনডিফারেণ্ট।'

আমি নিজে থেকেই মাঝে মাঝে গিয়ে বসতাম তাঁর কাছে। তিনি কখনো আমাকে ডেকে পাঠাননি। একদিন পাঠালেন। যেতেই একটি অতি-সাধারণ কিন্তু বহুল-প্রচারিত মাসিকপত্রের নাম করে বললেন, ওদের তুমি চেনো?

বললাম, চিনি। বুঝতে পারলাম না, ঐ কাগজটা সম্বন্ধে তিনি হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন কেন। নামে সাহিত্য-পত্রিকা, কিন্তু আসলে পাঁচমিশেলী। না আছে এমন বস্তু নেই—সিনেমা থেকে খেলার মাঠ, উলকাটা থেকে রান্নাঘর, বক্তৃতামঞ্চ থেকে রঙ্গমঞ্চ

এবং আরো অনেক কিছু, যার সঙ্গে সাহিত্যের দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সেই বহুবিধ পণ্যের ফাঁকে-ফাঁকে সসঙ্কোচ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে একটি দুটি গল্প, দু-একখানা উপন্যাস, কোনো একটা চলতি বিষয় নিয়ে দুপাতা হালকা সুরের প্রবন্ধ, ওদের ভাষায় যার নাম রম্য-রচনা। সেই অংশটুকুর স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান এমন স্তরের এবং বিষয়-বস্তু ও সাজ-সজ্জাদি এমন জাতের, যাতে করে পত্রিকাটি তার সুপুষ্ট দেহ নিয়ে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্টল থেকে অদৃশ্য হতে পারে। হয়ও তাই। সাধারণ, স্বল্পশিক্ষিত বহু মেয়ে-পুরুষের হাতে-হাতে ঘুরতে-ঘুরতে শীর্ণ কলেবরে 'শিশি-বোতল-কাগজ বিক্রী'র ঝোলায় গিয়ে ওঠে।

শিক্ষাভিমানী, বুদ্ধিজীবী, মানসিক আভিজাত্য গর্বিত উচ্চস্তরের এলাকায় তার প্রবেশ নিষেধ।

সেই কাগজের খবরে অলক রায়ের কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই তিনি বললেন, ওর সম্পাদক, কি নাম যেন, তাকে একবার গিয়ে বলো আমি রাজী আছি।

বিশাখা ঘরের ভিতরে কি করছিলেন। ছিটকে বেরিয়ে এসে বললেন, সেকি! ঐ কাগজে লিখবে তুমি!

আমারও ঐ একই জিজ্ঞাসা এবং বিশাখা দেবীর কণ্ঠে যে গভীর বিস্ময় ফুটে উঠল, আমিও তার সমান অংশীদার। না; আমার বিস্ময় আরো বেশি। আমি জানি, (বিশাখা তখনো আসেন নি,) ঐ কাগজের সম্পাদক একবার গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল অলক রায়ের বেনেটোলার বাড়িতে। প্রার্থনা ছিল—যে-কোনো বিষয়ে ছোটখাটো একটা লেখা। বিগলিত কণ্ঠে বলেছিল, 'বেশি কিছু চাই না, স্যার। শুধু আপনার নামটা।' ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যটা ছিল নিছক ব্যবসায়িক। ওঁর হাত ধরে জাতে ওঠা; অলক রায়ের যে পাঠক-সমাজ, ওর কাগজের কাছে যেটা অগম্য, ঐ নামের জোরে সেখানে একটু স্থান-সংগ্রহের চেষ্টা।

অলকবাবুর যা নিয়ম, শুধু একটু হেসেছিলেন। 'না' কথাটা তিনি কখনো মুখে উচ্চারণ করেন না, ওটা থাকে ঐ বিশেষ ধরনের হাসির মধ্যে। সেদিন তার মধ্যে 'না'-এর সঙ্গে আরো কিছু-কিছু ছিল। ঐ সম্পাদকের উপর এক ধরনের করুণা—লোকটা কি নির্বোধ! কার কাছে কি চাইতে এসেছে!

খবরটা আমি জানতাম। তাই শুধু বিস্মিত নয়, একেবারে থ হয়ে গেলাম।

ব্যাপারটা আরো দুর্বোধ্য মনে হল এই কারণে যে, সেদিন ওঁর পকেট ছিল একেবারে শূন্য। মা মারা গেছেন। দেশ থেকে কিছুই আসছে না, প্রকাশকরা হাত গুটিয়ে বসে আছে, অর্জুন কোনরকমে দুটো ডাল-ভাতের যোগাড় করতে পারছে, তাও হয়তো আর বেশিদিন পারবে না। এদিকে সেই সম্পাদক মোটা টাকার চেক নিয়ে জোড়হাতে সামনে বসে।

সে তুলনায় আজ তাঁর অবস্থা অনেক সচ্ছল। কিছুদিন আগেই একখানা প্রবন্ধ বইয়ের জন্য এক নতুন প্রকাশক কিছু টাকা গছিয়ে গেছে। তাছাড়া বিশাখা দেবীর রোজগার ভাল। দেশের জমি-জমারও একটা বিলি-ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বিশাখাই গিয়ে করে এসেছেন। নিয়মিত মাসোহারা শুরু হয়েছে আবার। অর্জুনের মুখে হাসি। চারদিকে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যের শ্রী, কোথাও কোনো মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই।

অলকবাবু স্ত্রীর কথার কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু ওষ্ঠ-প্রান্তে যে হাসিটি ফুটে উঠল, তার অর্থ আমাদের দুজনের কারো কাছেই অস্পষ্ট রইল না। অর্থাৎ, হ্যাঁ, ঐ কাগজেই লিখবেন বলে স্থির করেছেন।

বিশাখা দেবী এবার হতাশভাবে আমার দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা, আপনিই বলুন তো মলয়বাবু, ওঁর পক্ষে ঐ কাগজটায় লিখতে যাওয়ার কোনো মানে হয়? কী দরকার এমন করে জাত খোয়াবার?

আমি যোগ করলাম, তাছাড়া, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, কী লিখবেন উনি ওখানে।

দেখি কি লিখি, তেমনি হাসিমুখে জবাব দিলেন অলকবাবু, যে লোকটা বরাবর সানাই বাজিয়ে এসেছে, চেষ্টা করলে সে হয়তো বাঁশের বাঁশীও বাজাতে পারে।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি জাত খোয়াবার কথা বলছিলে বিশাখা। আজ সত্যিই মনে হচ্ছে, কী হবে এই জাত দিয়ে। এতকাল ধরে যা লিখেছি, সবই তো আভিজাত্যের শুকনো অভিমান নিয়ে তোমাদের ঐ 'মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি' বসে রইল। এবার না হয় এমন কিছু লিখি যা একটু চলে-ফিরে বেড়াতে পারে। তার বেড়াবার জায়গাগুলো যদি একটু নীচু স্তরের হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী?

'নীচু স্তর' কথাটা কানে যেতেই বিশাখা দেবীর কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তার মধ্যে ঘৃণা যতখানি তার চেয়ে বেশি বোধহয় স্বামীর জন্যে বেদনাবোধ। অলকবাবু সেটা লক্ষ্য করে কৌতুকের সুরে বললেন, এই যেমন ধর কোনো মেস্‌এর বাবুদের কেরোসিন কাঠের টেবিল অথবা একশো টাকা মাইনের স্কুল-মাস্টারের একমাত্র শোবার ঘরের ছেঁড়া মাদুর কিংবা বারান্দায় পাতা ন্যাড়া তক্তাপোষ। তার বৌয়ের বালিশের তলাও হতে পারে। তখন তার চেহারাটা নিশ্চয়ই সভ্য-ভব্য থাকবে না। কি বল?

এ প্রশ্নটা আমার প্রতি। তার সঙ্গে যোগ করলেন, রবীন্দ্রনাথের 'যথাস্থান' পড়েছ নিশ্চয়ই। মনে আছে সেই লাইন দুটো?—

"পাতাগুলিন ছেঁড়া খোঁড়া শিশুর অত্যাচারে।
কাজল-আঁকা, সিন্দুর মাখা চুলের গন্ধভরা—"

বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

উপস্থ-নীচ

—যা-ই বল, আমার কিন্তু ভালো লাগছে না।

স্ত্রীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তার করণ চুপ করে রইলেন। তাঁরও যে বিশেষ ভালো লাগছিল তা নয়। কিন্তু নিরুপায়।

মিসেস আবার বললেন, সামনেটা থাকবে ভাড়াটেদের দখলে! অমন সুন্দর গেট করলাম। পিলার দুটো দেখেছ? কী চমৎকার ডিজাইন! একটাতে বাড়ির নাম, আরেকটাতে তোমার নেমপ্লেট। কী লাভ হল ওটা ওখানে বসিয়ে? কেউ এসে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে ও নামের কাউকে চিনি না আমরা।

—না, তা কেন বলবে?

—বলতে বাধাটা কী? কী রকম লোক আসবে কে জানে? তারপর আমার এত শখের ঐ দেবদারুর চারাগুলো, ঐ মাধবীর ঝাড়—সব কতগুলো উটকো লোক এসে ভোগ করবে, আর আমি এক কোণের একটা সরু গলি দিয়ে চোরের মত নিজের বাড়িতে ঢুকবো!

ডাক্তার করণ মনে মনে স্বীকার করলেন, স্ত্রীর অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ভাড়া না দিলেও চলে না। করপোরেশন দিন দিন ট্যাক্স বাড়িয়ে চলেছে। সংসার খরচ বাড়ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কোনো জিনিস ছোঁয়া যায় না, অথচ কোনটা না হলে চলে? জীবনযাত্রার মান, যার নাম স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং, বড় বিচিত্র জিনিস। উঠতি আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠবে, কিন্তু পড়তি আয়ের বেলায় একচুল নামবে না। রোজকার অভ্যাসগুলো মৌরুসী স্বত্ব নিয়ে গেড়ে বসে। একবার যাকে প্রয়োজন বলে জায়গা দেওয়া হয়েছে, তাকে আর 'দরকার নেই' বলে তাড়াবার উপায় নেই।

জগদ্দলের কোন জুট মিল-এর মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন ডক্টর

করণ। রোজগার ভালোই ছিল। চাকারর খোলস ছাড়বার পরেও তার গন্ধটুকু গায়ে লেগে আছে। ধুতি পরেন না। বেরোতে হলে ট্রাউজার হাওয়াই শার্ট, বাড়িতে পায়জামা। একটা ড্রেসিং গাউনও চাপান তার উপর। মুখে দামী চুরুট। অধীরবাবু বললে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হন। পাড়ার বন্ধুরা, (অর্থাৎ তাঁরই মত অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের দল, রোজ বেলা পড়লে যাঁরা সামনের মাঠে গিয়ে গোল হয়ে বসে পুরনো দিনের চর্বিতচর্বণ করেন) তাঁর এই দুর্বলতাটুকু জানেন। তাই অন্যত্র যা-ই বলুন, সামনের উপর বলেন করণ সাহেব কিংবা ডকটর করণ।

পাটকলে পেন্‌সন নেই। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে ভালো টাকাই পেয়েছিলেন। তাই দিয়ে এই বাড়ি। নিউ সাউথ পার্কএর অভিজাত অঞ্চল। জমিতেই লেগে গেল অর্ধেক। বাকীটা দিয়ে কোনো রকমে দোতলার ঘর ক'খানা শেষ করলেন। হাত প্রায় খালি। দুটি ছেলেকে ভালো ভাবে মানুষ করেছিলেন। তাদের রোজগারের উপর ভরসা করে সঞ্চয়ের দিকে নজর দেননি। তখন বোঝেন নি কালের হাওয়া এত দ্রুত বদলে যাবে। বড়টি বড় চাকরি বাগিয়ে চলে গেল বাইরে। ছোটটিও নিজের পছন্দমত একটি স্ত্রী ও একটি ফ্ল্যাট জুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। সস্ত্রীক করণ সাহেব একটি তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে নিয়ে এই বাড়ির উপরে একান্ত-নির্ভর হয়ে পড়লেন।

অতএব ভাড়া না দিয়ে উপায় কি?

স্ত্রীকে বললেন, এক কাজ করলে হয় না? ওপরটা ছেড়ে দিয়ে আমরা বরং নীচে চলে আসি। তোমার গেট সমেত সামনেটাও হাতে রইল, ভাড়াও কিছু বেশী পাওয়া যাবে।

—কী যে বল!—প্রস্তাবটাকে সরাসরি নাকচ করে দিলেন করণ গিন্নী, আমরা থাকবো নীচে, আর আমাদের মাথার ওপর একপাল ভাড়াটে উঠে ভূতের নেত্য করবে! বুড়ো হয়ে তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে।

এ অঞ্চলে বাড়ির গায়ে "টু-লেট্" লাগাবার রেওয়াজ নেই, আভিজাত্যে বাধে। 'স্টেটস্‌ম্যান্'এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। যেদিন বেরোল ভোর বেলা থেকেই টেলিফোনের ভিড়। কত বিচিত্র গলা! কেউ মোটা, কেউ মিহি, কেউ হড়বড় করে ঝড় ছুটিয়ে দিচ্ছে, কেউ চিবিয়ে একটি একটি করে শব্দ ছাড়ছে। প্রশ্নাবলীর বৈচিত্র্যও কম নয়। মেঝেতে কি রকম মোজেইক,—প্লেন না নকশাকাটা, দেয়ালের রং কী, ডিসটেমপারড্ কিনা, কোন্ প্যাটার্নের জানালা—পুরনো না অ্যামেরিকান, দরজায় ল্যাচ্ কী আছে কিনা। বাথরুমে গীজার আছে তো?

টেলিফোন পর্বে কিছুটা ভাটা পড়ল তো শুরু হল দেখতে আসার পালা। কলকাতার শহর যে ভারতবর্ষের পকেট সংস্করণ, করণ সাহেব ঘরে বসে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলেন। কত রকমের চেহারা, পোশাক, ভাষা, কত ধরনের রুচি, হাবভাব চালচলন কথাবার্তা!

একজন এলেন, পুরোপুরি সাহেবী পোশাক। ইংরেজি উচ্চারণে ধরা পড়ল, দক্ষিণী। ডকটর করণ সঙ্গে সঙ্গে না দেবার সিদ্ধান্ত করে ফেললেন। এদের তিনি চেনেন। ঢুকবার সময় বলবে তিন জনের ছোট পরিবার, প্রথম কিছুদিন থাকবেও তাই। তারপরে একে একে ঢুয়ে ঢুয়ে সারা বাড়ি ভরে ফেলবে। চাকরি-সন্ধানী আত্মীয় আত্মীয়ার দল। অনাত্মীয়রাও অনায়াসে জায়গা পায় ওদের কাছে। বড় স্বগোষ্ঠীবৎসল জাত।

একজন ভীষণ পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। উনি বলেন ইংরেজি, উত্তর আসে রাজস্থানী হিন্দী ভাষায়। বড় বাজারে ঘি-এর কারবার। ভাড়ার অঙ্কে এক কথায় রাজী হয়ে গেল। এ 'রাজী'র অর্থও জানা আছে করণ সাহেবের। প্রথম দু-তিন মাস ঠিক দিয়ে যাবে। তারপরে আর এদিক মাড়াবে না। দেখা করতে চাইলে বাড়ির লোকেরা হয় বলবে "পূজা করতা হ্যায়", নয়তো "বাথরুম্‌মে হ্যায়"। অর্থাৎ বাড়িওয়ালার তখন 'হায় হায়' অবস্থা।

একটি পার্টি পছন্দ হল। ছেলেটি সওদাগরী অফিসে চাকরি করে,

অর্থাৎ বাঁধা রোজগার, যা ওরা চাইছিলেন। সংসার বলতে বুড়ো বাপ-মা, একটি ভাই, একটি বোন। মা এবং বোনকে সঙ্গে করে বাড়ি দেখতে এল। কথাবার্তা শুনে মহিলাটিকে ভালো লাগলো করণ-জায়ার। ছেলেটিও বেশ ভদ্র, বিনীত, আজকের দিনে যা দুর্লভ বললেই চলে। তার বোনও করণ সাহেবের মেয়ে রেখার প্রায় সমবয়সী। দুজনে তখনই ভাব হয়ে গেল। ডাক্তার করণ শুনে খুশী হলেন, ও পক্ষের কর্তাটিও তাঁরই মত অবসর-ভোগী। বকবক করবার সঙ্গী পাওয়া যাবে।

সে বিষয়ে প্রথম এবং প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল—একটা সাইন-বোর্ড। পিলারের গায়ে কাঠের ফলকে সুঠাম অক্ষরে লেখা 'এ. কে. করণ'এর ঠিক মাথার উপর—Beware of dogs, কুকুর হইতে সাবধান। দেখে করণ সাহেবের পিত্ত জ্বলে উঠল। তাঁর নামটা যেন কুকুরের চেয়েও অধম! আরো কারণ ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানীর চটকলে চাকরি করতে গিয়ে বহু রকমের সাহেবিয়ানা আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু সাহেবদের এই কুকুর-প্রীতি, ওঁর নিজের ভাষায়, কুত্তা নিয়ে চলাচলি জিনিসটা কোনোদিনই বরদাস্ত করতে পারেন না। শেষকালে তাঁর নিজের বাড়িতে এই উৎপাত এসে জুটবে কখনো ভাবতে পারেন নি। শুরু থেকেই নীচের তলার উপর মনটা বিরূপ হয়ে রইল। শুধু 'কুকুর হইতে সাবধান নয়', কুকুরওয়ালাদের সম্বন্ধেও সাবধান হয়ে চলাই স্থির করলেন, মেলামেশার চেষ্টা তো দূরের কথা।

নীচের ভদ্রলোকও বাড়িওয়ালা সম্পর্কে গোড়া থেকেই যেন একটা 'ডোন্ট্ কেয়ার' নীতি অবলম্বন করে চলছিলেন। তিনিও কেউকেটা নন, মানে, ছিলেন না। সরকারী অফিসে এল্ ডি ক্লার্ক থেকে গেজেটেড্ র‍্যাঙ্কে উঠেছিলেন। কোথাকার কোন্ চটকলের ডাক্তারকে আমল দেবার মত মনোভাব তাঁর নয়, সেধে যেচে আলাপ করতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

ঢোলা পায়জামার উপর ডোরাকাটা চায়না কোট চাপিয়ে বগলস-

গাঁথা অ্যালসেশিয়ানের চেন ধরে সিগারেট দাঁতে চেপে মিস্টার প্রধান রোজ সকালে বেড়াতে বেরোতেন। উপরের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে নিতেন এবং আকাশ পানে মুখ তুলে অনেকখানি ধোঁয়া ছাড়তেন। ভাবখানা এই—উপরে বসে বাড়িওয়ালা নামক যে লোকটা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগার ফুঁকছে, তাঁকেও তিনি অমনি করে উড়িয়ে দিচ্ছেন। অন্ততঃ ডাক্তার করণের তাই মনে হত।

একদিন সন্ধ্যার দিকে বেড়িয়ে ফিরছিলেন ডকটর করণ। নীচের তলায় গ্রামোফোনে হালকা হিন্দী গানের তাণ্ডব চলছে। ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। জিনিসটা তাঁর দু চক্ষের বিষ। কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না। গান তো চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে চোখে যা দেখলেন, সারা মনটা বিষিয়ে উঠল। দরজার আড়ালে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে আছে তাঁর কন্যা আর যেভাবে তাকিয়ে আছে যন্ত্রটার দিকে, মনে হচ্ছে এখনই সেটা গোগ্রাসে গিলে ফেলবে। অথচ নিজেদের গ্রামোফোনে যখন দুটো ভজন কিংবা একটা ইংরেজি বাজনার রেকর্ড দিতে বলেন, ঐ রেখাই মুখ কুঁচকে বলে, আমার অনেক পড়া রয়েছে বাবা।

দিন দুই পরে যা দেখলেন, একেবারে বসে পড়লেন করণসাহেব। ভাড়াটের ধিঙ্গী মেয়েটার সঙ্গে কোথায় যেন বেরোচ্ছে রেখা। দুজনেরই পরনে সালোয়ার কামিজ, এত এঁটে বসেছে দেহের সঙ্গে, মনে হচ্ছে দুটো ওয়াড় খোলা পাশ বালিস লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

মেয়েদের পোশাক সম্বন্ধে ডকটর করণ অনুদার নন। কিন্তু ঐ 'অজগরের ছাগল গেলা' রাস্তাঘাটে চোখে পড়লেই মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। তাই কিনা ঢুকলো তাঁর নিজের ঘরে!

বাড়ি ফিরতেই মেয়েকে ভীষণ ধমকে দিলেন। গৃহিণী তার হয়ে বলতে এসেছিলেন, "আহা, ছেলেমানুষ, দেখাদেখি শখ হয়েছে, পরুক

না? দুদিন পরেই এ ঝোঁক চলে যাবে।" করণ তাঁকেও দুকথা না শুনিয়ে ছাড়লেন না। বললেন, সে আশা বড়ই কম। সঙ্গীটি যা জুটেছে।

দেখা গেল, সঙ্গী শুধু ঐ মেয়েটা নয়, তার সতর-আঠার বছরের দাদাটিও যাতায়াত শুরু করেছে এবং রেখাও কল্যাণদার গন্ধ পেলেই আত্মহারা। ছোকরার ভাব গতিক, বিশেষ করে তার মাথার সামনে ঝুঁটির মত ওল্টানো চুলের গোছা, ফতুয়া মার্কা বুশ সার্ট, চোঙা প্যাণ্ট আর ছুঁচলো জুতো করণ সাহেবকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলল।

উপর-নীচের গৃহিনীদ্বয়ও দিনের মধ্যে বার কয়েক স্থান বদল শুরু করেছিলেন। কখনো ইনি নামছেন, কখনো উনি উঠছেন। প্রধান-গিন্নী করণ সাহেবের সামনেও পড়ে গেছেন দুএক দিন। একটু সেকেলে; তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টেনে দিয়েছেন। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও নাকি ভীষণ বাছ-বিচার। সেটাও যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নীচের রান্নাঘরে, যেখানে ধোঁয়া-ছাড়া উনুন অর্থাৎ মোটা খরচ করে 'সরকার চুলার' ব্যবস্থা করেছিলেন করণ, সেখানে তাঁর রান্না হত না। একটা তোলা উনুন বাইরে থেকে ধরিয়ে এনে বারান্দায় রান্না করতেন। তাহলেও খানিকটা ধোঁয়া তো উঠবেই। ডিসটেম্পার করা দেয়াল এবং ধব্ধবে সিলিং ময়লা হয়ে যাচ্ছিল। করণ সেটা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন, এবং মাথাটা গরম হয়ে উঠছিল।

একদিন পাশের গলিতে তোলা উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। ঝড়ো হাওয়ায় একরাশ ধোঁয়া উপরে করণ সাহেবের ঘরে এসে ঢুকল। রোজই ঢোকে। খুব বেশী নয়। তিনি উঠে গিয়ে সশব্দে জানালা বন্ধ করে দেন। আজ মেজাজটা কোনো কারণে এমনিতেই ভালো ছিল না, এবার একেবারে বিগড়ে গেল। ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা হাতে নিয়ে গটগট করে নেমে গেলেন। গেটের পিছনেই কুকুরটা বাঁধা থাকে। তেড়ে এলে ঠেকাবেন, এই উদ্দেশ্যেই লাঠিটা সঙ্গে রাখা। কিন্তু কুকুর তখন ছিল না। নির্বিবাদে ঢুকে গিয়ে

ইলেকট্রিক বেল বাজিয়ে দিলেন। বেরিয়ে এলেন মিস্টার প্রধান। লাঠিটার দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকালেন। ওয়াকিং স্টিকই বটে, তবে ঠিক 'স্টিক' নয়। বেশ মোটা চেহারা। অনেকটা কোঁতকা জাতীয়। বললেন—ইয়েস?

গলার স্বরে ভ্রূর কুঞ্চনে এবং চোখের চাহনিতেও অনেকখানি রূঢ়তা প্রকাশ পেল।

করণ সাহেবের কণ্ঠেও সেটা প্রতিফলিত হল। ইংরেজির উত্তরে ইংরেজিতেই বললেন, মে আই নো হাউ লঙ আই অ্যাম টু স্ট্যাণ্ড ছাট নিউস্যান্‌স্?...গলির মধ্যে ধূমায়িত উনুনের দিকে হাত তুললেন।

এর পরেও ইংরেজি চলল্। প্রধান বললেন, সে প্রশ্নে পরে আসছি। তার আগে জানতে চাই, এটা কী?—চোখ দিয়ে লাঠিটা দেখিয়ে দিলেন।

জিজ্ঞাসার ধরনটা অত্যন্ত প্রোভোকিং অর্থাৎ হুল ফোটানো বলে মনে হল। করণও তিক্তস্বরে জবাব দিলেন, দেখতেই পাচ্ছেন, কী।

—তা পাচ্ছি। কিন্তু এর উদ্দেশ্যটা কী?

উদ্দেশ্যটা বলে দিতে পারতেন করণ সাহেব, কিন্তু কেমন যেন কৈফিয়তের মত শোনাবে বলে কিছু না বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রধান সাহেব বাধা দিলেন, দাঁড়ান। ওটা কি আমাকে ভয় দেখাতে এনেছেন? যেহেতু আপনি ল্যাণ্ডলর্ড্ আর আমি টেনাণ্ট্?

—সম্পর্কটা কি আপনি অস্বীকার করতে চান?

—ও, নো, মি-লর্ড, আই ডু এ্যাড্‌মিট্ ইট্। বাট্—

—আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন!...বলে লাঠিটা ঠক করে মেঝের উপর ঠুকে দিলেন করণ সাহেব।

—আজ্ঞে না, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

—কিসের প্রতিবাদ?...রুখে দাঁড়ালেন করণ।

প্রধানও স্বর চড়ালেন, "এই অভদ্র ব্যবহারের"।

তারপরে দু তরফেই খেই হারিয়ে গেল। দুজনেরই চক্ষু রক্তবর্ণ এবং মুখ থেকে এমন সব বুলি নির্গত হল, যার কাছে বুলেটও

হার মানে এবং যার উপরে সত্যিই সভ্যতা বা ভব্যতার আবরণ রইল না।

এমন সময়ে অকুস্থলে অ্যালসিশিয়ানের আবির্ভাব এবং সগর্জনে করণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা। মনিবের শরীর বিশেষ সুস্থ নয় বলে বাড়ির চাকর ভোলা তাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ চেন টেনে আটকে না দিলে হয়তো আরো জটিল কিছু ঘটত। আপাততঃ কুকুরের আগমনে খণ্ড যুদ্ধটা বরং হঠাৎ থেমে গেল।

কিন্তু জের থামল না। উপরে এসেই করণ সাহেব তার ভাগনে এবং ভাইপোকে জরুরি তলব করে পাঠালেন। প্রথমটি দেওয়ানি উকিল। সে সরাসরি বলল, আপনার এই বাড়িটাকে বরং এখান থেকে উঠিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাড়ি থেকে ভাড়াটে ওঠানো অসম্ভব।

দ্বিতীয়টি পুলিস। সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, সোজা রাস্তায় কিছু করবার নেই, ঘুর পথে এগোতে হবে।

—কী করতে চাও? জিজ্ঞেস করলেন করণ সাহেব।

—একটু একটু করে চাপ দেওয়া, যাকে বলে প্রেসার ট্যাকটিক্‌স্‌।

উপরের বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। পিছনে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া গেল। গৃহিণীর উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন—"কী হয়েছে?" রেখার চাপা গলার উত্তরটাও কানে গেল। মা ও মেয়ে শশব্যস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, তাও দেখতে পেলেন।

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ডাক্তার করণ। ঘরে ঢুকে বাঁ হাতে একটা থলে এবং ডান হাতে একটা নল ঝুলিয়ে স্ত্রী কন্যার অনুসরণ করলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে যখন ফিরে এলেন, ভাগনে চলে গেছে কিন্তু ভাইপোটি তখনো অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

কাকার মুখে নিরুপায়ের ম্লান হাসি। বললেন, নাঃ, তোমার ঐ প্রেসার ট্যাকটিক্‌স্‌ চলবে না।

—কেন ?

—বেচারা নিজের প্রেসারেই অস্থির। ২১০ বাই ১১৫, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

নীচের বারান্দায়ও ঐ একই প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। প্রধান-গিন্নী বললেন, ওঁরও বুঝি এই রকম—

"এই রকম কী বলছেন!" বাধা দিলেন করণ-গিন্নী, এর চেয়ে বেশী।"

ভিতরের বিছানা থেকে কর্তার ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল, "তা একটু বেশী তো হবেই। উনি ল্যাণ্ড্-লর্ড, আমি টেনাণ্ট।"

বন্ধু ও প্রিয়া

এক

বিভূতি তার সীট থেকে উঠে দাঁড়াতেই সন্দীপ দেয়ালের দিকে তাকাল। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। মুখ টিপে হেসে বলল, তোমার হাঁটুতেও বুঝি ঘড়ির স্প্রিং লাগানো আছে?

—কী রকম?

—ওদিকে লম্বা কাঁটাটা লাফ দিয়ে বারোর ঘরে পৌঁছল, এদিকে তুমিও একটি লাফ মারলে।

—ওরে বাপরে! আজ এক সেকেণ্ড দেরি করবার উপায় নেই।

—আসবেন বুঝি?

—হুঁ, বলে বিভূতি তার সার্টের পকেট থেকে দুখানা রঙিন কাগজ বের করে দেখাল। চোখে মুখে খুশির ঝলক। সন্দীপ কলমের ডগায় টুপি পরাতে পরাতে বলল, বেশ আছো।

চলি, বলে ডান হাতটা উপরে তুলে পা বাড়াতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট সাহেবের পিওন এসে তার বিহারী বাংলায় জানাল, সায়েব ডাকছেন।

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী বরাট সাহেব। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ফাইল পার করা। তার জন্যে প্রতিদিন কতগুলো বাড়তি ঘণ্টা অফিসে বসে পার করেন এবং অন্যকে করান, সে হিসেব নেই, হুঁশও থাকে না।

বিভূতি মুখখানা কালো করে পিওনের পিছন পিছন কাছেই একটা কাঠের খুপরিতে গিয়ে ঢুকল, রাইটার্স বিল্ডিং-এ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারীদের অফিস বলতে যা বোঝায়, এবং বেরিয়ে এল মুখে আরেক পোঁছ কালি মেখে। হাতে একতাড়া কাগজ। সন্দীপ তখনো ছিল। বলল, কী ওগুলো?

—কী আবার! ওর গুষ্টির পিণ্ডি। এখ্খনি নাকি না দিলে হবে না।

—তা কী করে হবে? পিণ্ডদানের তো একটা কালাকাল আছে।

বিভূতি দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ভাবছিল। মনের অবস্থাটা মোটেই রসিকতা উপভোগের উপযোগী ছিল না। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং চাকরিতেও কয়েক ধাপ উঁচু হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর দিকে চেয়ে হতাশভাবে বলল, এখন কী করি বলুন তো সন্দীপদা?

—গিয়ে বল যে আমার একজন বান্ধবী অপেক্ষা করছে। তাকে নিয়ে ছটার শোতে সিনেমায় যেতে হবে।

—যান, এসব সিরিয়াস ব্যাপারে ঠাট্টা ভালো লাগে না।

—তাহলে আর কী করবে? টিকেটের পয়সা জলে নিক্ষেপ, এবং বান্ধবীর ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্তন।

—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? (বিভূতির চোখ-মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল) টিকেট দুখানা আপনাকে গছিয়ে দিই।

—তারপর?

—আপনি ওকে শিয়ালদ স্টেশন থেকে ছবিঘরে নিয়ে যাবেন। কাছেই তো।

—অ্যাঁ! রীতিমত চমকে উঠল সন্দীপ।

—তাতে দোষ কি?

—ছাখ বিভূতি, ল' কলেজে থাকতে বন্ধুত্বের খাতিরে প্রক্সি যে দু-চার বার দিইনি তা নয়। সে রিস্‌ক্ নিয়েছি। কিন্তু তুমি যে বিপদে ঠেলতে চাইছ—মাপ করো ভাই, ও আমার দ্বারা হবে না।

—না, সন্দীপদা, আমার এ উপকারটুকু আপনাকে করতেই হবে। আমার বিপদটা একবার বোঝবার চেষ্টা করুন।

এগিয়ে এসে সন্দীপের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। সন্দীপ বিরক্তির সুরে বলল, আরে তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি তাকে চিনি না, কখনো দেখিনি। শেয়ালদ স্টেশনে কোথায় খুঁজে বেড়াবো? আর, আমার সঙ্গে তিনি যাবেনই বা কেন?

—খুব যাবে। আপনাকে সে চেনে, মানে আমার কাছে আপনার কথা শুনেছে।

—এই মাটি করেছে! কী বলেছ তুমি আমার কথা?

বিভূতি ততক্ষণে একটা কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করে দিয়েছে। মুখ না তুলেই বলল, বলেছি, আমাদের সন্দীপদা একটি গুণ্ডা। তাকে দেখলেই পালাবে।

কাগজখানা আর টিকেট দুটো জোর করে সন্দীপের হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, থাকে কামারহাটি, ওর কাছেই কোন্ একটা কলেজে বি. এ. পড়ে। কলকাতার কিচ্ছু জানে না। অবস্থাটা বুঝতে পারছেন তো?

—তা তো পারছি। আমার অবস্থা যে তার চেয়েও কাহিল। এসব আমার একেবারেই আসে না, জানো তো?

—তার জন্যে ঘাবড়াবেন না। রেণুই সব ম্যানেজ করে নেবে। চালাক আছে। নর্থ স্টেশনে টিকেট কাউণ্টারের পাশে থাকবে। পাতলা, ফর্সা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা।

বরাট সাহেবের পিওন এসে তাগিদ দিল, সায়েব বোলছেন কেত্তনা দেরি হোবে।

—বলগে, হয়ে গেছে।

পিওনের পিঠে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সীটে গিয়ে বসল। পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে লম্বা করিডোরের প্রায় শেষে সন্দীপকে ধরল এবং চুপি চুপি বলল, একটা ট্যাকসি নিয়ে নেবেন।

—সে বুদ্ধি তোমার না দিলেও হত।

কাউণ্টারের পাশে "পাতলা, ফর্সা, সোনালী চশমা" একজনই পাওয়া গেল। একাধিক হলে খুবই বিপদে পড়ত সন্দীপ। এখনো নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হল না। একবার এগিয়ে দুবার ইতস্ততঃ করে বলে ফেলল, আপনি কি কামারহাটি থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ; কেন বলুন তো?

—আমি বিভূতির কাছ থেকে আসছি।

—"ও-ও। কী হয়েছে তার?"—উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

—না, না, কিছু হয় নি। অফিসের কাজে আটকা পড়ে গেছে। একটা চিঠি দিয়েছে আপনাকে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে রেণুকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার উপরে একটি বিনম্র মৃদু হাসি। "আপনি সন্দীপবাবু!" বলে নমস্কার করল।

সন্দীপ প্রতি-নমস্কার করে বলল, দেখুন না কী মুশকিল। ও আসতে পারল না, এদিকে আপনি এসে অপেক্ষা করছেন। বাধ্য হয়ে আমাকে—

—ভালোই হল। এই সুযোগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। ওঁর কাছে আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি। ভীষণ শ্রদ্ধা করে আপনাকে।

—ছেলেটা বড় ভালো। চলুন, ছটা বাজে। শুধু চিঠি পৌঁছে দেওয়া নয়, ছবি দেখাবার হুকুমও রয়েছে আমার ওপর। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

—না, না; সে কী কথা! আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াই তো ভাগ্যের কথা!

ছবিটা প্রেমমূলক। সন্দীপের পাশে বসে দেখতে রেণুকার একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল। আড়চোখে দু-একবার তার মুখের দিকে চেয়ে জানতে কৌতূহল হচ্ছিল ওঁরও কি তাই? ঠিক বুঝতে পারে নি। একটু অন্যমনস্ক লাগছিল। যেন ছবির দিকে মন নেই। অন্য কিছু ভাবছেন। কী ভাবছেন, কে জানে?

সন্দীপ সত্যিই অন্য কথা ভাবছিল। একেবারে অচেনা এবং অনাত্মীয়া একটি তরুণীকে নিয়ে পাশাপাশি বসে ছবি দেখা তার জীবনে এই প্রথম। কখনো ইচ্ছা হয় নি, এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে ইচ্ছার পিছনে কোনো চেষ্টা যুক্ত হয় নি। এসব বিষয়ে সে একেবারে আনাড়ি। নিজে থেকে সুযোগ যখন

আসে নি, এগিয়ে গিয়ে সুযোগ করে নেবার মত মনের গড়ন তার নয়। তাই তিরিশ পেরিয়েও সে সম্পূর্ণ নারী-সঙ্গ-বর্জিত। মা নেই, বাবা আছেন পুজোপাট নিয়ে। দাদারা আলাদা বাড়িতে সংসার নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং বধূবেশে কোনো নারী এসে তার সঙ্গিনীর অভাব পূরণ করবে, সে সম্ভাবনাও ক্রমশঃ পিছিয়ে গেছে। দু-একটি আত্মীয় বন্ধু, গোড়ার দিকে যারা এদিকে কিঞ্চিৎ আগ্রহ দেখিয়েছিল, তেমন কোনো সাড়া না পেয়ে ধরে নিয়েছে, সন্দীপ একাই থাকতে চায়। সেও নিজেকে সেই ভাবেই তৈরী করে নিয়েছিল।

মেয়েদের আকর্ষণ করবার মত প্রকৃতি বিধাতা তাকে দেন নি। অন্ততঃ তা-ই তার বিশ্বাস। চেহারায় ও স্বভাবে সকলের আগে যেটি চোখে পড়ে, সেটি নিটোল গাম্ভীর্য। কথাবার্তায় রস আছে, কিন্তু সেটা হালকা রস নয়। মেয়েরা তাকে শ্রদ্ধা করে সম্ভ্রম করে, কিন্তু তার সান্নিধ্যে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। সেও এ পর্যন্ত ঘটনা-চক্রে যে দু-একটি মেয়ের সঙ্গে মিশেছে, তাদের মধ্যে কোনো গভীরতার দেখা পায় নি। ওদিকটায় ওদের অভাব আছে, মেয়ে মাত্রেই কিছুটা লঘুচিত্ত, এইরকম একটা ধারণাই তার গড়ে উঠেছিল।

এই মেয়েটির মুখ দেখে সন্দীপের মনে হয়েছিল, এ হয়তো সেই সাধারণ দলে পড়ে না। এর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা দেখা মাত্র ফুরিয়ে যায় না, যাকে আর একটু তলিয়ে দেখতে এবং জানতে ইচ্ছা করে। লক্ষ্য করছিল, ছবির মধ্যে যেখানে একটু করুণ কিংবা গভীর স্পর্শ আছে, সেখানেও বেশির ভাগ দর্শক, বিশেষ করে দর্শিকা, শব্দ করে হাসছিল। সবই যেন ফান, মজা ছাড়া আর কিছুই যেন উপভোগ্য নয়। এই মেয়েটি হাসছিল না। নিবিষ্ট হয়ে দেখছিল। তার মানে, লঘু ছাড়া অন্য জিনিসও ওর অনুভূতিকে স্পর্শ করে, ওর কাছে তার একটা অ্যাপীল আছে।

এই মেয়ের সঙ্গে বিভূতির কি করে ভাব জমল, সেটা একটু আশ্চর্য মনে হল সন্দীপের কাছে। বিভূতি স্বভাবচঞ্চল, দু-দণ্ড স্থির

হয়ে বসতে পারে না, হাসি-গল্প হৈ-চৈ নাচ-গান ছাড়া থাকতে পারে না, মেয়েদের মধ্যেও সে সেই জিনিসই খোঁজে। তবে তার মনটি একেবারে স্বচ্ছ, কোথাও কোনো মালিন্য নেই, কোনো বাঁক নেই, সবটাই স্পষ্ট ও সরল। আর একটা জিনিস আছে বিভূতির মধ্যে, ইংরেজীতে যাকে বলে লাভেবল নেচার, যেজন্যে তাকে অত ভাল লাগে। হয়তো রেণুর আকর্ষণও সেইখানে।

টিকেট কেটে রেণুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে সন্দীপ জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল বললেন না তো?

—ছবি?

—হ্যাঁ।

—ভালো লেগেছে। আপনার?

—দেখুন, আমি ছবিটবি বড় একটা দেখি না। আজ আপনার সঙ্গে বসে দেখলাম। সন্ধ্যাটা বেশ কাটল।

কথাটা ভারী মিষ্টি লাগল রেণুকার কানে। মনের ভিতরেও অনেকখানি খুশি ছড়িয়ে পড়ল। ছবি নয়, ওঁর ভালো লেগেছে তার সঙ্গ। আজকের এই সন্ধ্যাটি তার কাছেও স্মরণীয় হয়ে রইল।

এই ধরনের কথা, এর চেয়ে অনেক অন্তরঙ্গ কথা রেণুকা বিভূতির মুখে কতদিন শুনেছে। কিন্তু তার মধ্যে কেমন একটা স্থূলতা আছে। বড় বেশী স্পষ্ট, খোলাখুলি, বেআবরু। শুনলে গা সিরসির করে, কিন্তু মনটা মাধুর্যে ভরে দেয় না, আজ এইমাত্র যার স্পর্শ সে অনুভব করল। বিভূতির কথায় যেন কোনো আর্ট নেই। একই কথা সোজাসুজি বলা আর একটু সুন্দর আবরণে সাজিয়ে বলায় যে কত তফাৎ তা সে জানে না।

চলন্ত ট্রেনে বসে আর একটা জিনিস ভাবতে ভাবতে গেল রেণুকা। বিভূতির তুলনায় ইনি কত ভদ্র, কত সংযত। সিনেমার দুটো সীটের মাঝখানে যে হাতল, যার উপর সে হাত রেখেছিল, ওঁর হাতখানাও সেখানে মাঝে মাঝে এসে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছেন। ওপাশে একটা মোটা মানুষ ওদিকের সব

হাতলটা জুড়ে রেখেছিল। ওঁকে পুরো আড়াইটা ঘণ্টা প্রায় আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে হয়েছে। রেণুকার ইচ্ছা করছিল, বলে, এখানে হাত রাখুন না? আমার কোনো অসুবিধা নেই। লজ্জায় বলতে পারে নি। কি জানি কী মনে করবেন!

বিভূতির সঙ্গে যেদিন প্রথম ছবি দেখে, সেই দিনটা মনে পড়ল। সারাক্ষণ ধরে তার উদ্যত কনুই ও বাহুভাগ মাঝখানের হাতলের উপর এবং মাঝে মাঝে হাতল ছাড়িয়ে তার দেহের স্পর্শ নেবার সুযোগ খুঁজছিল। রেণুকার যে খুব ভাল লেগেছিল তা নয়। চেষ্টা করেছিল যতটা সম্ভব ওদিক ঘেঁষে যতখানি এড়ানো যায়। তারপর ক্রমশঃ সয়ে গেছে। আর এড়াবার চেষ্টা করে না। বিভূতি তার পুরো সুযোগ নিয়ে থাকে। স্বাস্থ্যবান প্রাণোচ্ছল যুবক। তার এই ঘন-সান্নিধ্যে রেণুকার তরুণ দেহে কোনো শিহরণ তোলে না, মনে কোনো সাড়া জাগায় না, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবে তার সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, মাঝে মাঝে তার মনে হয়, তার চেয়ে তার এই যৌবনপুষ্ট তনুর প্রতিই বিভূতির আকর্ষণ বেশী। সেই দিকে চেয়েই সে তার মন যোগায়, তার মুখে খুশি ফোটাবার চেষ্টা করে। আর মনে হয়, ও যেন বড় খেলো, বড় ভাসা-ভাসা, বড় চঞ্চল। ও যদি সত্যিই তাকে ভালোবেসে থাকে, হয়তো বেসেছে, তার মধ্যে আবেগ যতখানি, অনুভূতি তার চেয়ে অনেক কম। সে ভালবাসা যতটা উচ্ছল ততখানি গভীর নয়।

দু সপ্তাহ পরেই নর্থ স্টেশনের সেই কাউণ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রেণুকা। তার জন্যে সে পর পর দুখানা চিঠি পেয়েছে। বিভূতি ছুটতে ছুটতে এসে তাকে দেখেই আনন্দে ফেটে পড়ল, চিঠি পেয়েছ তাহলে? রেণু দুটো আঙুল তুলে দেখাল। তারপর বলল, তোমার বুঝি মনে হল, একটা চিঠিতে আমি আসবো না?

—তা কেন? কি জানি, যদি না পাও? ডাকের চিঠি, মারাও যেতে পারে।

—বেশ গেল। একদিন না হয় না-ই পেলে আমাকে?

—ওরে বাপরে! তাহলে আমি মারা যাবো। বলে, সেই স্টেশনের ভিড়ের মধ্যেই ওর হাতে এমন চাপ দিল, যে রেণুকা একটা অস্ফুট চিৎকার করে বলে উঠল, আমার হাতটা কি লোহা?

—কে বললে? এক তাল মাখন!

—খুব হয়েছে। চল, কোথায় যেতে হবে।

—সিনেমায় চল। মেট্রোতে একটা খুব ভালো ছবি এসেছে। 'এ' মার্কা ছবি।

—না, ওসব আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে এসো, বেড়াই।

—কোথায় যাবে?

—চল ইডেন গার্ডেনে কিংবা গঙ্গার ধারে।

—বেশ।…এই, ট্যাকসি……

—আবার ট্যাক্‌সির কী দরকার?

—ঐ তো বাস্‌-ট্রামের অবস্থা। উঠতে পারবে?

—কেন, এখানে কোথায় যেন ট্রাম-ডিপো আছে—

ততক্ষণে ট্যাকসি এসে ফুটপাথ ঘেষে দাঁড়িয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে বিভূতি। রেণুকা উঠতে উঠতে বিরক্তির স্বরে বলল, খালি খালি কতগুলো টাকা না ওড়ালে আর চলছিল না!

—খালি খালি মানে? ভিড়ের কষ্টটা বুঝি কিছু না? তাছাড়া ট্যাকসিতে যেমন—

থেমে যেতেই রেণু মুখ তুলে বলল, কী?

—থাক; শুনলে তুমি আবার বকতে শুরু করবে!

ইঙ্গিতটা ওর চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পেরেছিল রেণুকা, তাই কিছু না বলে আর একটু ধারের দিকে সরে গেল। বিভূতির কাণ্ডজ্ঞান বড় কম। ড্রাইভার এবং দু পাশের লোকজন—কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চায় না। এই মুহূর্তে আর একটা কাণ্ড করল।

পকেট থেকে দুখানা সিনেমার টিকেট বের করে জানালা দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

রেণুকা চমকে উঠল—এ কী করলে!

বিভূতির মুখে একগাল হাসি, যেন ভারী একটা মজা করে ফেলেছে। বলল, ইডেন বা গঙ্গার ধারে বেড়াতে টিকিট লাগে না।

—কী আশ্চর্য! টিকিট কিনে ফেলেছ জানলে ওখানেই না হয় যাওয়া যেত।

—তা হয় না; আমার কাছে দুখানা টিকিটের চেয়ে একজনের ইচ্ছার দাম অনেক বেশী।

কথা কটি যে রেণুকার ভালো লাগল না তা নয়, তবু বাইরে গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলল, এসব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় না। কবে তোমার একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হবে, বলতে পার?

বিভূতি হাসিমুখে রেণুকার মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে বলল, তোমাকে কার মত দেখাচ্ছে বলবো?

—কার মত?

—ঠিক আমাদের বরাট সাহেব!

এবারে রেণুকাও হেসে ফেলল। বরাট সাহেবের কথা সে অনেক শুনেছে। বলল, আবার বুঝি খুব বকুনি খেয়েছ?

—বকুনি বলে বকুনি! চাকরিটাই বোধ হয় নিয়ে নিত, সন্দীপদা গিয়ে কোনোরকমে বাঁচিয়ে দিলেন। ও, ভালো কথা, সন্দীপদা সেদিন তোমাকে দেখে খুব খুশী হয়েছেন।

—যাও, যত সব বাজে ঠাট্টা।

—সত্যি বলছি। অবিশ্যি, ঠিক সোজাসুজি বলেন নি। সেটা ওঁর ধরন নয়। একটু ঘুরিয়ে বলেছেন।

—"কী বলেছেন?"—রেণুকার মনে অদম্য কৌতূহল।

—আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম তোমার কথা, বললেন, আই কংগ্রাচুলেট্ ইউ! সত্যি, আমার বন্ধুভাগ্য খুব ভাল। একদিকে সন্দীপদা, আরেক দিকে—

বলে রেণুকার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। সে বাধা দিল না।

ইডেনের ছায়া-ঢাকা পথে বেড়াতে বেড়াতেও সন্দীপের কথা ঘুরে ফিরে এসে পড়ছিল। বিভূতিকে জানতে না দিয়ে সুকৌশলে রেণুকাই তাকে মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে আসছিল সেই প্রসঙ্গে।

"সন্দীপদার বাড়িতে তার বাবা, আর ঠাকুর-চাকর ছাড়া কেউ নেই। দিন কাটে অফিস আর পড়াশুনো নিয়ে। আড্ডা নেই, ক্লাব নেই, মাঝে মাঝে বাইরে চলে যান। চাকরিতেও খুব উন্নতি করেছেন। এরই মধ্যে অনেককে ডিঙ্গিয়ে হেড্ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ হয়ে গেছেন। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী হতেও খুব বেশী দেরি নেই। বিয়ে-থা করেননি। কে খোঁজ করে? বাবা ধম্ম-কম্ম নিয়ে আছেন, দাদারা আলাদা। মা তো অনেকদিন হল নেই। আগে আগে দু-চারটে ভালো সম্বন্ধ এসেছিল, কেউ গা করেনি। এখন যদি কেউ বিয়ের কথা পাড়ে হেসে বলেন, 'বুড়ো হয়ে গেছি। এ বয়সে কারো পাণিপীড়ন মানে সত্যিই পীড়ন।' অথচ বয়স আর কত! তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে, আমার চেয়ে মাত্তর পাঁচ-ছ বছরের বড়।"...এমনি অনেক কথা বলেছিল বিভূতি।

॥ দুই ॥

রেণুকার দিদি চন্দনার শ্বশুরবাড়ি কামারহাটির পাশে। নিজের দিদি নয়, ওর মেজোমামার বড় মেয়ে। বিয়ে হয়েছে পাঁচ-ছ বছর, একটি বাচ্চা। রেণুর সঙ্গে খুব ভাব। মামাতো বোন হওয়ায় দুদিকেই সুবিধা। স্বচ্ছন্দে প্রাণ খুলে দেওয়া যায়, মায়ের পেটের বোনের কাছে যা সব সময়ে চলে না। কিছু স্বার্থের দ্বন্দ্ব, কিছু গোপন রেষারেষি, হয়তো কিছু প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ছোঁয়া সেখানে সব কথা অকপটে বলতে দেয় না। বিষয় বুঝে একটু রেখে ঢেকে বলতে হয়। বিশেষ করে, যেখানে মনে হবে, এটা বাবা-মার কানে যেন না ওঠে,

সেখানে অন্ততঃ না থামলে বিপদের সম্ভাবনা। এসব ক্ষেত্রে সম্পর্কের দূরত্বই বরং দুজনকে আরো নিকটে টেনে আনে।

রেণুর বেলায় তাই হয়েছিল। নিজের দিদিকে যা বলত না, তার অনেক বেশী গিয়ে বলত চন্দনাদিকে। বিভূতির কথা প্রায়ই হত, এবং তার মধ্যে কিছুই প্রায় বাদ পড়ত না। একটু আধটু পড়লেও চন্দনা সেটা তার বয়স বুদ্ধি এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে নিত। জায়গা বুঝে দু-একটা চটুল ফোড়ন দিয়ে বোনকে একটু রাঙিয়ে দিত। মাঝে মাঝে অভিভাবিকার ভাবনাও থাকত তার মধ্যে। একটু গভীর সুরে বলত, তোর কথা শুনে শুনে যা বুঝছি, ছেলেটা বড় কাঁচা, বড় অপলকা। ভাবছি, ভার সইবে কি না।

একদিন বলল, আমার নাম করে আসতে বলিস তো। একবার দেখবো।

বিভূতি শুনে খুব খুশী। পরের সপ্তাহেই ছুটে গিয়ে দেখা করেছিল চন্দনাদির সঙ্গে। সারাটা বিকেল হৈ-চৈ করে, চা-খাবার খেয়ে, নিজে থেকেই আবার আসবার কথা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। তার পরেও আরো দুবার কামারহাটি যাতায়াত করেছে। রেণুকাদের বাড়ি নয়, চন্দনার কাছে। রেণু তাকে তাদের বাড়িতে কখনো যেতে বলেনি, বাবা-মার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয়নি। চন্দনাই নিষেধ করেছিল—এখন থাক না! আরো কিছুদিন যেতে দে।

এতদিন চন্দনা শুধু বিভূতির কাহিনী শুনেছে, সে কি বলল, কি করল; এবার শুনল সন্দীপের কাহিনী। দেখা মাত্র একদিনের, কথাও দু-চারটির বেশী নয়, কিন্তু শোনা অনেকখানি, এবং শোনার উপর ভিত্তি করে গড়াও হয়তো কিছু ছিল, সজ্ঞানে নয়, নিজের অজানতে, এসব ক্ষেত্রে একটি তরুণীর মন যা করে থাকে। সব মিলিয়ে বলা যা হল, তার বিস্তৃতি কম নয়। তার উপরে চন্দনা নিজের চোখ দিয়ে যা দেখল, সেটুকুও জুড়ে দিল। তখন কিছু বলল না। বিভূতির বেলায় যা করে থাকে, খানিকটা সরস তামাসা, তাও করল না, কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

দু-চার দিন পরে রেণু যেই গেছে, যেমন যায়, ওকে দেখেই হঠাৎ বলল, সেই ভদ্দরলোকের ঠিকানাটা দিতে পারিস ?

—কোন ভদ্দরলোক ?

—ঐ যে তোমার নতুন বন্ধু।

—ছি, কাকে যে কী বল, তার ঠিক নেই।

চন্দনা হাসিমুখে কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোনের মুখটা দেখে নিল, তারপর বলল, আচ্ছা, না হলেন বন্ধু, তাঁর ঠিকানাটা আমার দরকার।

—আমি কোত্থেকে দেবো ?

—কেন, বিভূতিকে বললেই দিয়ে দেবে।

—যদি বলে, কী করবে ঠিকানা দিয়ে ?

—ও, তাও তো বটে। আচ্ছা, ওকে আমার কাছে আসতে বলিস। আর—" বলে, একবার তাকাল ওর দিকে।

—থামলে যে ?

—মাস দুই ওর সঙ্গে দেখাশুনো বন্ধ রাখ।

রেণু একটু অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে মুখ টিপে হেসে বলল, কী! খুব কষ্ট হবে ?

রেণু সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, তোমার মতলবটা কী বল তো ?

—মতলব আবার কী! তুই পারবি কিনা বল। ও চিঠি লিখবে, অমুক জায়গায় থেকো। তুই যাবি না, চিঠিরও উত্তর দিবি না। বড্ড মন খারাপ করবে, না রে ?

—ভীষণ! ভাবছি পাগল-টাগল না হয়ে যাই! সত্যি বলছি, দিদি, মাঝে মাঝে কী যে বোরিং লাগে, জানো ?

—তা তো লাগবেই। একখানা খুব ভালো শাড়িও পাঁচবার পরতে ইচ্ছে করে না। যে-গানটা খুব পছন্দ, তাও কয়েকবার শুনবার পর একঘেয়ে হয়ে যায়। তবু ওগুলো বদলানো যায়; একটা ভালো না লাগে, আরেকটা পরো, আরেকখানা শোনো। সবকিছুর বেলায় তো সে কথা খাটে না। বিশেষ করে একটা জিনিস।

সেখানেও কিছুটা বদলাবদলি চলে। কিন্তু সব ঐ গোড়ার দিকে। একবার বেছে নেওয়া হয়ে গেলে যতই বোরিং লাগুক যমে ছাড়বে না।

রেণুকা সবটা মন দিয়ে শুনে বলল, তোমার বক্তৃতাটি বেশ, কিন্তু লক্ষ্যটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আপাতত না বুঝলেও চলবে।

॥ তিন ॥

সন্দীপ কদিন থেকে লক্ষ্য করছিল, বিভূতি বেশির ভাগ সময় গম্ভীর হয়ে থাকে, কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কখনো বা বিনা কাজে খানিকটা বাইরে ঘুরে আসে। প্রায়ই বরাট সাহেব ডেকে পাঠান, এবং সেখান থেকে যখন ফেরে, মুখ দেখেই বোঝা যায় নেপথ্যে অনেক কিছু হয়ে গেছে। সাজপোশাকের দিকে সে বরাবর একটু বেশী মনোযোগী। বর্তমানে সেখানেও সুস্পষ্ট অবহেলা।

দু-চার দিন অপেক্ষা করে একদিন একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কী বিভূতি?

—কই, কিছু না তো!

—বলতে না চাও, সে আলাদা কথা। তবে 'কিছু না' বললেই তো সব-কিছু উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিভূতি একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, এখন নয় আপনার বাড়ি গিয়ে বলবো।

পরদিন সন্ধ্যার পর সন্দীপ একটানা শুনে গেল—প্রায় দু মাস হতে চলল, বারবার চিঠি লিখেও রেণুর কাছ থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছে না। কামারহাটিতে ওর এক দিদি থাকেন। তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেও সুবিধা হয় নি। তিনি বললেন, ও একটু ব্যস্ত আছে, সামনে পরীক্ষা। পরে দেখা করবে। ভাবসাবে মনে হয় ইচ্ছা করেই আসছে না।

সব শুনে, ভিতরে ভিতরে বন্ধুর জন্যে একটু চিন্তিত হলেও, (কেননা, তার পক্ষে ব্যাপারটা খুব লঘু নয়) বাইরে সহজ করে দেবার চেষ্টা করল সন্দীপ—এইজন্যে হাঁড়িমুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছ? নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে আছে, তাই আসছে না।

—চিঠির একটা উত্তরও তো দিতে পারে।

—হয়তো সত্যিই পরীক্ষা-টরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছে।

—পরীক্ষা মানে কলেজের টার্মিন্যাল না কি। সেসব কবে চুকে গেছে।

সন্দীপ একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, তোমরা কদ্দূর এগিয়েছ বল তো?

—মেয়েরা তো কিছু পষ্ট করে বলে না। তবে যদ্দূর বুঝেছি, ওর কোনো আপত্তি নেই। শুধু বি. এ দেবার অপেক্ষা।

—গার্জেনরা কী বলেন?

—রেণুর আসল গার্জেন ওর বাবা-মা নন, ঐ দিদি। তার ওপরে সব ভার। ও-ই বলেছে, আমাকে তার খুব ভালো লেগেছে। আমারও তাই মনে হয়েছে।

সেদিন আর কোনো কথা হল না। দিন কয়েক পরে সন্দীপ ছুটির পর বাড়ী যাবার পথে বিভূতিকে বলল, সন্ধ্যার পর একবার যেও।

—কেন?

—এমনিই বলছি। গল্প-টল্প করা যাবে।

বিভূতি বুঝল, শুধু গল্প করবার জন্যে সন্দীপদা তাকে ডেকে পাঠাননি। একটু চিন্তিত হয়েই গেল।

সন্দীপ এ-কথা ও-কথার পর জিজ্ঞাসা করল, ওদিকের খবর কি?

—একদম চুপ। আর একটা চিঠি লিখেছি। যদি তার মন বদলে গিয়ে থাকে. খোলাখুলি জানাতে বলেছি। কোনো জবাব নেই।

—জবাব দিয়েছে। সে নয়, তার দিদি। তার কথাই কি তুমি বলেছিলে সেদিন? নামটা বোধ হয় চন্দনা!

—হ্যাঁ, ঐ সেই দিদি। কী লিখেছেন?

বিভূতির আগ্রহাকুল চোখের দিকে চেয়ে সন্দীপ বলল, তোমার কথা কিছু নেই। আমার সঙ্গে তাঁর বোনের বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন।

বিভূতির মুখটা হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল। একটা ক্ষীণ অস্ফুট আওয়াজও বোধ হয় বেরিয়ে এল তার ভিতর থেকে, যদিও সেটা কোনো ভাষা নয়, আর চোখ দুটোয় একটা অর্থহীন বিহ্বলতা ফুটে উঠল। সন্দীপ তৎক্ষণাৎ আর কিছু বলল না। বোধ হয় বন্ধুকে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হবার সময় দিল। তারপর কী বলা যায় যখন ভাবছে, বিভূতিই তাকে, বলতে গেলে, প্রায় বিস্ময়ে অভিভূত করে দিল। আশ্চর্য কোমল সুরে বলল, আপনাকে একটা কথা বলবো, সন্দীপদা?

—বল।

—আপনি আপত্তি করবেন না। রেণুকে তো আমি অনেকদিন ধরে দেখছি, ওরকম মেয়ে হয় না। চেহারার কথা বলছি না। ওর মত কিংবা ওর চেয়ে ভালো দেখতে ঢের মেয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু অমন সুন্দর মন! ঐ রকম বুদ্ধি! কত সহজে কত দরদ দিয়ে সবকিছু বুঝে নেয়!

বিভূতির মুগ্ধ কণ্ঠ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল, আমি ঠিকই বলছি, সন্দীপদা, রেণু আপনার অযোগ্য হবে না। বলেন তো, আমি এ চিঠির উত্তর দিয়ে দিচ্ছি।

"এ কী রকম হল!" সন্দীপের কণ্ঠে ছদ্ম বিস্ময়ের সুর। "তোমার এ কথাগুলো তো ঠিক ছকে মিলছে না বিভূতি! এইচ. জি. ওয়েলসের একটা বই পড়েছিলাম, তার মধ্যে তিনি একজনকে দিয়ে বলিয়েছেন—তোমরা দুজন পরম বন্ধু, a woman comes and you are enemies. আমি তো সেইটাই আশা করছিলাম—আজ থেকে আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।"

—"কী যে বলেন!" ঠিক হাসি নয়, হাসবার মত মুখ করল বিভূতি।

তারপরেই সে উঠতে চাইছিল। কিন্তু সন্দীপ তাকে চেনে, তাই যেতে দিল না। একরকম জোর করেই রেখে দিল, সে রাতে আর মেস্‌এ ফিরতে দিল না। মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে রাতকাটানো বিভূতির পক্ষে অবশ্য নতুন নয়।

পরদিন ছিল রবিবার। সকাল বেলা চায়ের পাট সেরে দুজনে গিয়ে বসল সন্দীপের শোবার ঘরের সামনের বারান্দায়। সন্দীপ বলল, "বুঝলে বিভূতি, তোমার ঐ রেণুর কথা কাল আমি অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছি। একটি মেয়েকে নিয়ে এত সময় কাটানো আমার এই প্রথম। মেয়েটিকে খুব বেশী দোষ দিতে পারলাম না। শুধু একটি বন্ধু নিয়ে যখন চলে, সেই রোমান্সের বয়স ও পার হয়ে এসেছে। ফিজিক্সের ভাষায় ও এখন গ্যাস্ বা বায়ুস্তর থেকে সলিড্ অর্থাৎ নিরেট বস্তুর সন্ধান করছে। শুধু উড়ে বেড়ানো নয়, শক্ত মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়ানো। সেখানে আশ্রয় হিসেবে তোমার চেয়ে আমি বেশী নম্বর পাচ্ছি। বয়সের জন্যে অবিশ্যি খানিকটা কাটা যাচ্ছে, কিন্তু অন্য সব দফায় সে ঘাটতি পূরণ করেও কিছু উপরে আছি। হিসেবের ব্যাপার। অস্বীকার করবার উপায় নেই।"

সামনে কিছু দূরে একটা ছোট্ট পার্ক। সেখানে কতগুলো ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলা করছিল। সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সন্দীপ আবার তার পূর্ব সূত্রে ফিরে গেল—"কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, বিভূতি। তোমাকে যেমন আমি চিনি, সেও নিশ্চয়ই এতদিনে চিনতে পেরেছে। তোমার ভিতরে যা কিছু আছে, তার জানতে বাকী নেই। জেনেও এমন একটা জিনিস যে-মেয়ে শুধু অঙ্কের ফর্মুলায় ফেলে বাতিল করে দিতে পারে, তার বুদ্ধির তারিফ অবশ্যই করবো, কিন্তু ঐ যে বললে "একটি সুন্দর মন," ওখানে আমি একটি শূন্য ছাড়া তাকে আর কোনো নম্বর দেবো না। ঐ 'মন' বা হৃদয় বলে কোনো বস্তু তার নেই। থাকলেও সেটা কখনো জানবার চেষ্টা করে নি।

এতক্ষণে বিভূতির মুখে কথা শোনা গেল। ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, আমার মনে হয়, ঐ দিদির পাল্লায় পড়ে—

—তাহলে তো আরো মারাত্মক। একজনের পাল্লায় পড়ে এত শীগগির যার অন্তরের সব রঙ্‌ মুছে যায়, সব দীপ নিবে যায়, আমাকে তুমি তার পাল্লায় ফেলতে যাচ্ছ? রক্ষে কর বাপু!

বিভূতি চুপ করে বসেছিল। এবার তার দিকে ফিরে ধীরে ধীরে বলল সন্দীপ, তোমার আঘাতটাকে আমি লঘু করে দেখছি না বিভূতি। তবে জানি, সেটা কাটিয়ে উঠতে দেরি হবে না। আজ না হলেও কদিন পরেই বুঝবে, এমন কিছু বোধ হয় হারালে না, যার জন্যে তোমার মত ছেলের সত্যিই আপসোস করা সাজে।

গল্প হিসাবে এইখানেই বোধহয় এ কাহিনীর সমাপ্তি-রেখা টেনে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু এটা গল্প নয়, আরো কিছুদূর এর জের টেনে চলতে হবে। পাঠক-পাঠিকারা 'ইন্‌-আর্টিস্টিক' বলে নাসিকা কুঞ্চন করবেন জানি। কি করবো? জীবন তো আর্ট মেনে চলে না।

সন্দীপ ও বিভূতির যে বন্ধুত্ব, তার প্রথম পত্তন ওদের পাঠ-জীবনে, যখন একজন ছিল কলেজের ছাত্র, আরেকজন স্কুলের। তার মধ্যে খানিকটা গুরু-শিষ্য ভাবও ছিল। অর্থাৎ ভালবাসার সঙ্গে ভক্তি ও স্নেহের মিশ্রণ। সেটা বরাবর রয়ে গেছে। হয়তো সেই কারণেই বয়সের তফাৎ এবং চাকরির অসাম্য ওদের বন্ধুত্বে কোনোদিন ফাটল ধরাতে পারে নি, বরং উভয়ের ভিতরকার জোড়গুলোকে শক্ত করে তুলতে সাহায্য করেছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে সিমেন্টিং। মাঝখানে কিছুদিন বিভূতির জীবনে একটি রেণুর আবির্ভাব দুই বন্ধুর জীবন-দর্শনে কিছুটা আলাদা স্রোত নিয়ে এসেছিল। তার অন্তর্ধান, এবং যেভাবে সেটা ঘটল—দুয়ে মিলে ওদের আবার সেই পূর্ব সম্পর্কের বৃত্তের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

নারী সম্পর্কে একটি দার্শনিক অনীহা একসময়ে উভয়ের মধ্যেই

ছিল। রেণুকা এসে একজনকে তার থেকে উদ্ধার করে তার মধ্যে একটা নতুন অভিজ্ঞতার মধুর স্বাদ এনে দিয়েছিল। পরবর্তী অভিজ্ঞতা সেই মাধুর্যের সবটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়ে রেখে গেল শুধু তিক্ততা।

অতঃপর দুই বন্ধু "শত হস্তেন—" সাবধান বাণী উচ্চারণ করে শাড়ি পরিহিত জগৎ থেকে সভয়ে সরে দাঁড়াল।

পুজোর ছুটিতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া—ওদের বরাবরের নিয়ম। সেবার গিয়েছিল শিমুলতলা। তার কারণ এ নয়, যে জায়গাটির জল-হাওয়া ভালো, কিংবা তার চারদিক ঘিরে নাতিদূরে ছোটনাগপুরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো যে বলয় রচনা করেছে, (ল্যাট্টু পাহাড়ের কাঁধে চড়ে যার পুরো নকশাটা পাওয়া যায়) সে দৃশ্যটি অতি মনোরম; এও নয় যে, রামপাখী-ভুকদের ওটা রাম-রাজত্ব। তার প্রধান কারণ, ওখানে বিজলি বাতি নেই। ওরা এটা হাড়ে হাড়ে জানে যে বাংলার বাইরে দুদিনের তরে-বেড়াতে-আসা মানুষগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর, একটা প্রবল আসঙ্গলিপ্সা জেগে ওঠে, এবং প্রায়-অচেনা অথবা মুখ-চেনারা রাস্তাঘাটে পথ আগলে 'এই যে কবে এলেন' বলে দীর্ঘ আলাপ জুড়ে দেয়, বাড়ি চড়াও করতেও ছাড়ে না। এখানে সে সম্ভাবনা দেখা দেবে না। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে পথচারী মাত্রেই ভূত। বাড়িতে বাড়িতেও প্রায় তাই। কালিমাখা হারিকেনের ওপাশে নিজের স্ত্রীকেও চেনা দায়। সুতরাং নির্বিবাদে নিজের মনে কটা দিন কাটিয়ে দেবার মত এমন স্থান আর নেই।

বাজারের ভিতর দিয়ে যে ধুলোর রাস্তাটা তিলুয়ার দিকে চলে গেছে, তার থেকে একটা পথ উঠেছে উত্তরে—কিছুটা গাছপালা ঘেরা সহজ চড়াই। তার পরেই এখানকার অভিজাত পল্লী। বাঁদিকটা ঢালু, ডানদিকে সারি সারি বাড়ি। খানিক এগিয়ে গেলে আবার উৎরাই। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা নেমে গিয়ে মিশে গেছে দিগন্ত প্রসারিত মাঠের কোলে। সেখানে গিয়ে পড়লে বহুদূর-শ্রুত গানের কলি মনে পড়ে যায়—'এ পথ গেছে কোন্‌খানে ?'

ঐ পল্লীতে 'রিজ' বলে একটি বাড়ি আছে। বাড়িটা এমন কিছু আহামরি নয়, কিন্তু তার অবস্থানটি বড় সুন্দর! সন্দীপ একদিন বলেছিল, এখানে দাঁড়ালে 'ইটারনিটি' বলতে কী বোঝায়, তার একটু আভাস পাওয়া যায়। বিভূতিও ঐ পথে বেরোবার এবং ফিরবার মুখে বাড়িটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে যায়, কখনো গেটের সামনে একটু দাঁড়ায়। একদিন বলেও ফেলেছিল, বাড়িখানা কিনে ফেলুন সন্দীপদা।

সন্দীপ হেসে বলেছিল, এ নিয়ে কখানা বাড়ি কেনা হল, বিভূতি?

—না; সত্যি। এরকমটা আর কোথাও দেখিনি।

উক্তিটি অবশ্য নতুন নয়। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বার উচ্চারিত হয়েছে।

এমনি একদিন সকালবেলা মাঠের দিকে যাবার মুখে দুজনেই ওখানে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। গেটের ভিতর থেকে একটি সাদর অভ্যর্থনা ভেসে এল, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন না?

একটি প্রায়-মধ্য-বয়সী সুবেশ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললেন, আপনাদের প্রায়ই দেখি, হয় এদিকে না হয় ওদিকে চলেছেন। এই পাড়াতেই থাকেন বুঝি?

সন্দীপ বলল, আজ্ঞে না, আমরা আছি স্টেশনের ওপার।

—ও, ওদিকটা আমাদের এখনো যাওয়া হয় নি। আসুন।

—আমরা একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এখানে বেড়ানো ছাড়া আর কাজটা কী? দু মিনিট বসে যান। ওরে……

একটা নাম ধরে ডাকলেন। একটি ভৃত্য আসতেই দুখানা চেয়ার আনতে বললেন। একখানা আগে থেকেই ছিল। এর পরে আর না বসে পারা যায় না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক। একটু বেশী বকেন, আর মিনিট কয়েকের আলাপেই অন্তরঙ্গ হতে পারেন। বললেন, আপনাদের

দুজনকেই কেমন যেন নিরিমিষ মনে হয়। একা একা ঘোরেন। সঙ্গে তো কাউকে দেখি না।

বিভূতি 'নিরামিষ' কথাটার মানে প্রথমটা ধরতে পারে নি, এবার পারল। বলল, আজ্ঞে আমরা একাই।

—তাই বলুন। আমিও মশাই অনেকদিন একাই কাটিয়েছি। কিছু ব্যবসা-ট্যাবসা আছে। তাই নিয়েই ছিলাম। আজ বম্বে, কাল বাঙ্গালোর, তার পরদিন কানপুর। সারাক্ষণ কাজ নিয়ে ডুবে আছি। তারপর হঠাৎ একদিন মনে হল, কার জন্যে কী করছি। তখন ঝপ্ করে বাঁধা পড়ে গেলাম। আমার এক বন্ধুর শালী; সেই দিল জুটিয়ে। প্রথমটা খুব ভয় হয়েছিল, জানেন? এত কাল খোলা মাঠে চড়ে বেরিয়েছি, এই বুড়ো বয়সে আবার বাঁধন-ছাঁদন সইবে তো? কদিন পরেই দেখলাম, এ বড় সুখের বাঁধন। যার হাতে পড়েছি, কী বলবো মশাই, বহু ভাগ্য করলে তবে এরকমটা মেলে। একেবারে মাথায় করে রেখেছে। ওকে বাদ দিয়ে এখন আর একটি দিনও চলে না।

সন্দীপ বলল, আমরা তাহলে এখন উঠি। রোদ বেড়ে যাচ্ছে।

—বলেন কী! একটু চা না খাইয়ে কখনো ছাড়তে পারি? তাছাড়া আসল মানুষটির সঙ্গেই তো আলাপ হল না। বাজারে গেছে। ও-ই সব করে, আমি খাই-দাই ঘুরে বেড়াই। এই তো, নাম করতে না করতেই এসে গেছে।

গেটের কাছে গলার আওয়াজ পেয়েই চমকে উঠেছিল বিভূতি। একবার তাকিয়েই কাঠ হয়ে গেল। সন্দীপ প্রথমটা চিনতে পারে নি। বন্ধুর দিকে নজর পড়তেই বুঝতে পারল। আগের চেয়ে একটু ভারী হয়েছে! তাতে বরং ভালোই দেখাচ্ছে। বেশভূষার বহর লক্ষণীয়!

ও তরফও হঠাৎ থমকে গিয়েছিল। সেটা শুধু ক্ষণিকের। তারপরেই একটি উল্লাসময় মধুর চমক—"এ কি! আপনারা কখন এলেন!"

"তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি!"—স্বামীও কম অবাক হন নি।

—পরিচয় মানে! নিকট সম্পর্ক। দাদা হন আমার।

—আরে বল কি! একেবারে একজোড়া বড় কুটুম্ব! কি খাওয়াবে, আগে বল! ওঁরা কি আসতে চাইছিলেন নাকি? জোর করে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছি।

'এক মিনিট' বলে রেণুকা দ্রুতপায়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। দু হাত ভর্তি বাজারের জিনিস।

সেইদিকে চেয়ে বিভূতির মনে হল, রূপ, ঐশ্বর্য এবং গৌরবে মণ্ডিত একটি সমূর্ত সাফল্য তার চোখের উপর দিয়ে চলে গেল।

প্রচুর জলযোগ এবং প্রচুরতর আপ্যায়নের পর দুজনে যখন বাসার দিকে চলল, বেশ বেলা হয়েছে। পথে কোনো কথা হল না। ঘরে ফিরে জামাটা ছেড়ে ফেলে দেরিতে আসা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে সন্দীপ বলল, রেণুকা তাহলে ঠকে নি।

বিভূতিকে মনে হল কিসের মধ্যে যেন নিবিষ্ট হয়ে আছে। ধীরে ধীরে যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে বলল, আমি ভাবছি ঐ ভদ্দরলোকের কথা। একেই বলে সুখী মানুষ।

মিনিট কুড়ি কেটে গেল। প্রফেসরের দেখা নেই। মেয়েরা দলে দলে গোল হয়ে, কেউ বেঞ্চে বা হাইবেঞ্চে বসে, কেউ পাশে দাঁড়িয়ে তুমুল আড্ডা জমিয়ে তুলেছে। চারদিক থেকে নানা কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে দুটি শব্দ—'এই, শোন্—' এদের যেটা চিরন্তন রীতি।

পৃথিবীতে দুটি জাত আছে, নারী ও পলিটিশিয়ান, যারা শুধু শোনাবে, শুনবে না।

এই মুহূর্তে একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল। একটি মেয়ে গিয়েছিল আফিসে খবর আনতে। ফিরে এসে অধ্যাপকের মঞ্চের উপর চড়ে তীক্ষ্ণস্বরে জানিয়ে দিল, জেম আসছেন না। সঙ্গে সঙ্গে সব কলরব বন্ধ। যে যেখানে ছিল হুড়মুড় করে গিয়ে ঘিরে ধরল তাকে। সবগুলো চোখ ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল—কি ব্যাপার বল তো?

ব্যাপার তো বুঝতেই পারছ—মেয়েটির চোখের কোণে ঠোঁটের বাঁকে চাপা হাসি। তার মধ্যে রহস্যময় ইঙ্গিত। শুধু ইঙ্গিতে খুশী হবার মত মনের অবস্থা তখন কারুর নয়। সে-ও বোধহয় নিজেকে আর একটু ব্যক্ত করবার জন্যে উৎসুক। বলল, বি. কে. সি'র সঙ্গে সেই যে একটা—কী বলব?

কে একজন বলে উঠল, ড্যাশ্!

এক পশলা হাসির ঝঙ্কার।

—হ্যাঁ, ঠিক্ বলেছিস। সেই ড্যাশ্‌টা উঠে গেল আর কী! কাজেই জেম্ আর আসছেন না।

সেই সুরসিকার কণ্ঠ আবার শোনা গেল, "অর্থাৎ ফিল আপ্ দি গ্যাপ্-এর কোয়েশ্চেনটায় পুরো নম্বর পেলেন জনাদি।"

জনা মজুমদার। সংক্ষেপে জে. এম্.।

মেয়েরা তাকে আরো সংক্ষেপ করে নিয়েছিল, জেম্। নামকরণটা অর্থহীন নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিল জনা। তাছাড়া

চেহারায় সাজপোশাকে, চলনে বলনে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য ছিল যে তার রীতিমত রূপসী ছাত্রীরাও এই তরুণী অধ্যাপিকাকে ঈর্ষার চোখে না দেখে পারত না। তার তুলনায় বি. কে. সি. অর্থাৎ বাংলার অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রকিশোর চন্দ নেহাত ম্যাড়মেড়ে। এই দুটি নামের মাঝখানে একটি যোগচিহ্ন বসিয়ে সিঁড়িতে করিডোরে, কমন-রুমে পিছনের বেঞ্চিতে যেদিন গোপন কানা-ঘুষা শুরু হল এবং সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য আলোচনার স্তরে গিয়ে পৌঁছল, অনেকেই বিশ্বাস করতে চায়নি। বি. কে. সি-র মধ্যে কী দেখল জেম্!

এবারে অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ নাক সেঁটকাল। কারো কারো চোখ উঠল কপালে। কিন্তু অনেকেই খুশী হল। সংসারে সুখ-সমাপ্তিই বেশির ভাগ মানুষের কাম্য। অলস্ ওয়েল দ্যাট্ এণ্ড্স ওয়েল্।

আর ক্লাস নেই। হৈ-চৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল মেয়েরা। কেউ কেউ চলল নীরবে, পা দুটিও মন্থর। যেতে যেতে হয়তো একটু ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল মনের কোণে। তাদের জীবনে জেম্-এর মত একটি 'ড্যাশ্'-এর আবির্ভাব ঘটে থাকবে। কে জানে কেমন করে ভরতি হবে সে ফাঁকটুকু? হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে? যদি হয়, যে শব্দটি সেখানে বসাতে চেয়েছিল সেটি হয়তো বসানো যাবে না, যে-কোনো একটিকে বসিয়ে দায় চুকিয়ে ফেলতে হবে। বিশ্ববিত্তালয়ের প্রশ্নের চেয়ে জীবনের প্রশ্ন অনেক বেশী অনিশ্চিত!

কলেজের ঠিক সামনেই বাস্-স্টপ। অন্যদিন সেখান থেকেই উঠে পড়ে দীপালী। আরো অনেক মেয়ে ওঠে। আজ বন্ধুদের ভিড়টা এড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল ফুটপাথ ধরে। নিতান্ত অবান্তর এবং অভাবিত একটা দৃশ্য মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল, যার জন্যে একটু একা থাকবার প্রয়োজন।

দিন কয়েক আগেকার ঘটনা। শেয়ালদার মোড়ে বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে দীপালীকে রোজ নর্থ স্টেশনে বিরাটীর গাড়ি

ধরতে হয়। ওদিন এ-পারের ফুটপাথ দিয়ে ফলের দোকানগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। বাবা আরেক দফা জ্বর থেকে উঠেছেন। ভীষণ অরুচি। কদিন থেকে বলছিলেন, একটু আমসত্ত্ব পেলে তাই দিয়ে দুটো ভাত খেতে পারেন। মা শুনেও চুপ করে ছিলেন। সংসারের যা অবস্থা, ঐ বাড়তি কয়েক আনা পয়সা খরচ করতে গেলে অনেক জায়গায় টান পড়ে। কোথায় হাত দেবেন বোধহয় বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ফয়সালাটা দীপালীই করে ফেলল। অনেকটা আপনা থেকে হয়ে গেল, বলা চলে।

পর পর দুদিন বাস কণ্ডাকটর ভাড়া চাইতে এল না। ভিড়ের চাপে আসতে পারল না তার কাছে। গোটাকয়েক পয়সা বাঁচল, কিন্তু মনের ভিতরটা খচ্ খচ্ করতে লাগল। ভাড়াটা তার দেয়। নিজে গিয়ে যেচে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাবে কেমন করে? সেখানেও তো ঐ ভিড়ের প্রশ্ন। তবু খানিকটা কষ্ট করলে হয়তো হাত বাড়িয়ে দেওয়া যেত পয়সাটা; অন্ততঃ চেঁচিয়ে বলতে পারত, টিকেট দিন। কী দায় পড়েছে তার? নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল দীপালী। ভাড়া আদায় করা ওদের দায়িত্ব। ওরা যদি তা পালন না করে, সে কেন গায়ে পড়ে অত কষ্ট করতে যাবে? তাছাড়া অনেকেই তো দেয় না, ইচ্ছা করে গা-ঢাকা দেয়, দিচ্ছি, দিচ্ছি বলে নেমে পড়ে। তার কলেজের মেয়েরাও আছে সেই দলে। তবে তারই বা এমন মনখারাপ করবার কী আছে? এ যুগে অত নীতিবাগীশ হওয়া চলে না।

তারপর থেকে সুযোগ পেলেই টিকেট ফাঁকি দেয় দীপালী। যখনই দেয়, মনের একটা কোণ খুঁত খুঁত করতে থাকে।

পরক্ষণেই আরেকটা দিক এসে তাকে থামিয়ে দেয়।

এমনি করে কিছু পয়সা জমল। বাবার আমসত্ত্বের ব্যবস্থা হল।

প্যাকেটটা হাত-ব্যাগে পুরে রাস্তা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল দীপালী।

ফুটপাথের অনেকখানি জুড়ে নানারকমের সওদা সাজিয়ে ফেরিওয়ালারা নানা সুরে চিৎকার করছে। হঠাৎ কানে গেল একটা অন্যধরনের সুর। অনেকটা নীচু, যেন চেঁচাতে অভ্যস্ত নয় লোকটি, হয়তো সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। 'ভালো ব্লাউজ আছে নেবেন ? তাছাড়া ছেলেদের প্যাণ্ট, মেয়েদের ফ্রক—'

দীপালী চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। কথাগুলো তার উদ্দেশ্যে নয়। তার একটু পিছনে একজন প্রৌঢ়া মহিলা আসছিলেন। তার দিকে চেয়ে বলছিল লোকটি। এ স্বর যে তার অনেক কালের চেনা। শুধু কি স্বর, মানুষটা আরো বেশী। কিন্তু অনেক বদলে গেছে। না যদি চিনত, নিজেকে দোষ দিতে পারত না।

কানুদা। তাদেরই গ্রামের (এখন আর তাদের নেই, চিরকালের তরে হারিয়ে গেছে) পূব পাড়ার বোসেদের বাড়ির বড়ছেলে। জম-জমাট অবস্থা ছিল। সবাই বলত বড়বাড়ি। লতায় পাতায় জড়ানো কি একটা সম্পর্ক ছিল দীপালীদের সঙ্গে। কানুদার বাবা সেটা স্বীকার করতেন না। ও করত। সেই সুবাদে মাঝে মাঝে আসত তাদের বাড়ি। বাইরে থেকে দরাজ গলায় 'খুড়িমা' বলে এক হাঁক দিয়েই ভিতরে চলে আসত। মা খুব খুশী হতেন। বাবা বাড়ি থাকলে সস্নেহ সমাদরে ডেকে নিয়ে বসাতেন। দীপালীর তখনকার মনেও এক ঝলক হঠাৎ খুশি ছড়িয়ে পড়ত। সেই সঙ্গে বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে উঠত। কাছে যেতে ইচ্ছা করত, কিন্তু পা দুটো যেন কিছুতেই চলতে চাইত না। মা ডেকে পাঠাতেন। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াত।

কানুদা তখন ঢাকায় পড়ে। আসছে বছর বি. এ. দেবে। কত গল্প করত কলেজের, হস্টেলের, আরো নানা জায়গার, নানা বিষয়ের। খেলা-ধূলাতেও মস্ত নাম-ডাক ছিল কানু বোসের। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি স্বাস্থ্য। কত ভক্ত তার! ছেলে, মেয়ে দুইই। দীপালীর চৌদ্দ বছরের জীবনে অতি অনায়াসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল কানুদা। তাকে ঘিরে বাবা-মার মনেও যে একটি ভীরু

আকাঙ্খা অঙ্কুরিত হয়েছিল, কিন্তু বোসেদের ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে মাথা তুলতে সাহস করেনি, সে খবরও জানত দীপালী।

তারপর এল সাতচল্লিশের সর্বনাশ। জন্ম জন্ম ধরে যার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধন, সেই মাটি যেন রাতারাতি পায়ের তলা থেকে সরে গেল। শুধু একা দীপালীদের নয়, তাদের মত লক্ষ লক্ষ নরনারীর। তবু আরো তিনটা বছর নানারকম লাঞ্ছনা সয়ে কোনরকমে ভিটে আঁকড়ে পড়েছিলেন ভবনাথ পাল। পঞ্চাশের ধাক্কা যখন এল, আর পারলেন না। মেয়েটাকে নিয়েই বেশী ভাবনা। একদিন রাত্রির অন্ধকারে স্ত্রী-কন্যা এবং দুটি শিশুপুত্রের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন 'বর্ডার'-নামক এক অজানা, অনিশ্চিত লক্ষ্যের উদ্দেশে।

তার আগে বড় বাড়ির বড়কর্তা জগৎ বোসকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, আপনিও চলুন দাদা, আর থাকা ঠিক নয়। কথাটা তিনি তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, তিনখানা গাঁয়ের সব মিঞার টিকি, থুড়ি, দাড়ি এই হাতে বাঁধা। আসুক না দেখি, কার কত বড় বুকের পাটা।

ভবনাথ অত সাহস করলেন না। প্রতিবেশী মুসলমানেরা কোন ভরসা দিতে পারল না। কেউ কেউ বরং বলল, আর দেরি করবেন না পালমশাই, আমরা আপনাদের বাঁচাতে পারব না।

দীপালীরা চলে এল। টাকাকড়ি সামান্য যা সঙ্গে আনতে পেরেছিল, সারা পথে ছড়াতে ছড়াতে আসতে হল। তা না হলে মান-প্রাণ নিয়ে এপারে এসে পৌঁছতে পারত না।

আসবার সময় কানুদার সঙ্গে দেখা হল না। সে তখন ঢাকায়।

তারপরেও অনেকদিন তাদের খবর পায়নি। এই মাস কয়েক আগে কে যেন বলছিল তার বাবাকে, ওদের চলে আসবার মাসখানেক পরেই জগৎ বোসকে খুন করে টাকা-কড়ি জিনিস-পত্তর সব লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল গুণ্ডারা। বাড়ির লোকেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে বলতে পারল না।

আরেকবার পিছনের দিকে চোখ ফেরাল দীপালী। ভিড়ের আড়াল থেকে ভালো করে দেখল। কোথায় গেছে সে রঙ? সারা মুখখানা রোদে পোড়া, কণ্ঠার হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, চোখের সে জ্যোতি নেই। যেন কত বয়স হয়ে গেছে এই ক'টা বছরের মধ্যে।

একবার ইচ্ছা হল দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ওর সামনে। কিন্তু যদি চিনতে না পারে। সামনে দিয়েই তো এল। চিনল কই? একটু অভিমান হল। পরক্ষণেই সেটা ঠেলে সরিয়ে দিল দীপালী। ছিঃ ছিঃ, কী ছোট মন তার! কানুদা তাকে চিনবে না? 'দীপু'কে ভুলে যাবে? তাই কখনো সম্ভব? কত মেয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ করে একজনকে লক্ষ্য করে নি। করার কথাও নয়।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে আবার সামনের দিকেই পা চালিয়ে দিল। ফিরে যাওয়া হল না। লজ্জায় পড়বে কানুদা। কোথায় ছিল আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো মনে মনে বিরক্ত হবে, যেমন অনেকেই হয়, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়-স্বজন। আজকের দুঃস্থ রূপটা আপনজনের কাছে ব্যক্ত হোক, এটা কিছুতেই সইতে পারে না। দেখা হলেই 'কি ছিল' তাই নিয়ে মিথ্যা দম্ভ, 'কী হয়েছে' তাকে ঢেকে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা। কানুদাও কি তাই করবে; কে জানে? মানুষ বড় বদলায়। বাইরের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরটাও। জীবনের শ্রী যখন চলে যায়, মনের উপরেও সেই মালিন্যের ছাপ পড়ে।

তাছাড়া, কী হবে দেখা করে?—যেতে যেতে নিজের মনকে বোঝাল দীপালী, তাতে আজ কোন তরফেই কোন লাভ নেই।

ট্রেনে উঠে ভাগ্যক্রমে একটা কোণ জুটে গেল। চোখের উপর রইল মাঠঘাট, গাছপালা, বাড়ি-ঘর, আর মন জুড়ে রইল ফুটপাথে ফেলে আসা সামান্য একটা দৃশ্য, এবং তাকে ঘিরে কতদিনের কত কথা!

আসবার দিন যদি থাকত কানুদা। হয়তো তাদের সঙ্গে চলে

আসত। একটি অসহায় বুড়োমানুষের সঙ্গে অতবড় বিপদের মুখে তাদের ছেড়ে দিত না।

বিপদ কি শুধু ওপারে? এপারে পৌঁছেও কত ঝড় গেছে তাদের উপর দিয়ে। কত লাঞ্ছনা, কত গ্লানি। কত অভিশাপ।

ধুবুলিয়া ক্যাম্পের সেই দিনগুলো মনে পড়লে সারা শরীর পাক দিকে ওঠে। সবে পনেরোয় পা দিয়েছে তখন। স্বপ্ন দেখবার বয়স। দুচোখ মেলে যা দেখবে, সব রঙীন, রমণীয়। তার জায়গায় কী দেখে এল, মানুষের কি বীভৎস রূপ, জীবনের কি কুৎসিত ছবি। আঘাতে আঘাতে সব স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। চূর্ণ হয়ে গেল সব বিশ্বাস, সব শ্রদ্ধা।

অথচ লোকগুলো যখন এল, ঠিক্ এল নয়, দলে দলে শিশু থেকে বুড়ো নানা বয়সী মেয়ে-পুরুষগুলোকে কারা যেন বাক্স-প্যাঁটরার মত গাদা করে এনে ফেলল একটা বিশাল রোদে-পোড়া মাঠের মধ্যে, গায়ে গায়ে লাগানো ছোট ছোট খুপরির গর্ভে, যার নাম রিফিউজি ক্যাম্প, তখনো তারা বাইরে যাই হোক, মনের দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে যায় নি। শ্রদ্ধা প্রীতি, স্নেহ মমতা, একের প্রতি অন্যের সমবেদনা, লজ্জা সঙ্কোচ, আব্রু, সংযম, ন্যায়-অন্যায় বোধ—সমাজ ও সভ্যতার যা কিছু মৌলিক উপাদান, সবই তাদের ছিল। এখানে বসে বসে দেখতে দেখতে সব হারিয়ে ফেলল। কি ভয়াবহ সে বিবর্তন! পরিবেশের এমন প্রচণ্ড শক্তি, মনুষ্যত্বের সর্বশেষ বিন্দু টুকুও যেন নিংড়ে বের করে নিল অতগুলো নরনারীর বুকের ভিতর থেকে। কেউ আর মানুষ রইল না।

দীপালীর বয়স তখন পঞ্জিকার মাপে পনেরো, কিন্তু অভিজ্ঞতার খাতায় অনেক বেশী। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, তার চারদিকে একদল নখী, দন্তী, শৃঙ্গী অহরহ উদরের ধাঁন্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছলে বলে কৌশলে দুটি অন্ন-সংগ্রহ। তার জন্যে কে কাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, যেখানে নামতে হয় নামবে। ক্ষুধা। ক্ষুধাই একমাত্র চরম সত্য জীবনে। আর তার সঙ্গে জড়ানো—মনে

আসতেও সারা দেহ কুঁচকে ওঠে দীপালীর—সেও আরেক রকমের ক্ষুধা। আরো ভয়াবহ, লজ্জাহীন, আক্রহীন, বাছবিচারহীন।

তার কবলে পড়ে কত ফুলের মত মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আজও তাদের কারো কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কলকাতার জনারণ্যে। বাইরেটা দেখে বোঝা যাবে না, কিন্তু দীপালী জানে ভিতরে ভিতরে এখনো তারা সেই অভিশাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। ওখানে একবার নামলে আর কূলে ওঠা যায় না। সবাই কি বাধ্য হয়ে নেমেছিল? কেবল মাত্র অবস্থার বিপাকে পড়ে? না। কেউ যে স্বেচ্ছায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, এই কঠোর সত্যটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দীপালী জানে। কিন্তু কি ছিল তার পিছনে, প্রলোভন, না প্রবৃত্তির তাড়না, কিংবা অন্য কিছু, তার জানা নেই।

দীপালীও হয়তো একদিন ওদের দলে গিয়ে ভিড়ত। হাতে-খড়ি তো ওখান থেকে হয়ে গিয়েছিল। সেই মেঘে ঢাকা বিকেলটা যদি মুছে ফেলা যেত জীবন থেকে! কিছুতেই তা হয় না। উঠতে বসতে যখন তখন সে সামনে এসে দাঁড়ায়, গাঢ় ছায়া ফেলে ঢেকে দেয় অনাগত দিনের সমস্ত আলো।

তখন সবে এসেছে ক্যাম্পে। পাশের ঘরের একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। রোজ বিকেলে তার এক দাদার সঙ্গে বেড়াতে যেত। একদিন বলল, যাবি? চল না একটু ঘুরে আসবি। দীপালী বলেছিল, না; মা বকবে।

—আচ্ছা, আমি বলছি মাসিমাকে।

দীপালীর মা মেয়েকে চোখে চোখে রাখতেন। কখনো বেরোতে দিতেন না। সেদিন বোধহয় মায়া হল। সারা দিন রাত একটা ছোট্ট গুদামের মধ্যে বন্ধ থেকে থেকে এরই মধ্যে আধখানা হয়ে গেছে মেয়েটা। বললেন, সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস।

মা মনে করেছিলেন, প্রকাশ্য দিনের আলোয়, চারিদিকে এত লোক গিজগিজ করছে, ভয় কিসের? তিনি জানতেন না, গভীর অরণ্যে যেমন দিন আর রাত বলে কিছু নেই, সেখানকার অধিবাসীরা

বাধা-বন্ধহীন, সকলের সামনে সব কিছু করতে পারে, এই ধুবুলিয়ার মাঠের মানুষগুলোও তেমনি বনচারী পশুর মত বন্ধন-মুক্ত। লোক-লজ্জার অন্তরালটুকুও চলে গেছে। দীপালীও কি ভাবতে পেরেছিল সে কথা?

সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসেছিল ঠিক, কিন্তু চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে। বাধা দিতে গিয়ে দেখল চারদিকের চোখে সেটা অতি বেমানান, হাস্যকর।

মা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন করলে পাছে নগ্ন সত্যটা সাপের মত বেরিয়ে পড়ে, তাই বোধহয় তাকে ঝাঁপির মধ্যেই থাকতে দিয়েছিলেন। সেদিন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছিলেন, ওখান থেকে কেমন করে বেরিয়ে পড়া যায়।

বিরাটীর এই জবর-দখল কলোনীর সন্ধান যেদিন এল, ক্যাম্পের কয়েকজন লোক গোপনে খবর নিয়ে এল ভবনাথের কাছে, তিনি প্রলুব্ধ হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারলেন না। ঐ 'জবর' কথাটায় বাধল। জোর করে পরের জমি দখল করবেন? মাস্টার মানুষের মন সায় দিল না। কিন্তু দীপালীর মা-র মনে এতটুকু দ্বিধা দেখা দিল না। তাতে কী হয়েছে? এত লোক যাচ্ছে।

ভবনাথ অন্য যুক্তি পাড়লেন, পরে যদি বিপদে পড়তে হয়? মালিক এসে জোর করে তুলে দেয়?

—সে তখন দেখা যাবে।

বিপদ সত্যিই এসেছিল। একবার লাঠিসোঁটা নিয়ে মালিকের লোক, আরেকবার পুলিস। কিন্তু ততদিনে অনেক লোক এসে বসে গেছে। মারধোর খেয়েও উঠল না। তারপর রফা হয়ে গেল সরকারের সঙ্গে। কাউকে উঠতে হবে না। কিছুদিন আগে পাকা দলিল এসে গেছে। ওরা বলে অর্পণ-পত্র।

প্রথমে সকলের সাহায্যে একটি টিনের চালা তুলেছিলেন ভবনাথ কিছুদিনের মধ্যে ঐ কলোনীর স্কুলে চাকরিও পেয়ে গেলেন, তার

সঙ্গে গোটা দুই টিউশানি। তারই উপর ভরসা করে কো-অপারেটিভ থেকে কিছু ধার নিয়ে দুখানা ঘর তুলেছেন। পাকা দেওয়াল, পাকা মেঝে, উপরে টালি। ছেলে-মেয়েরাও পড়াশুনো করছে। কোনো রকমে চলে যায়। ইদানীং শরীরে ভাঙন ধরেছে। প্রায়ই অসুখে পড়েন। বয়সও হয়েছে। এখন সব চেয়ে বড় ভাবনা মেয়ের বিয়ে।

মেয়ে অবশ্য তা ভাবছে না। তার লক্ষ্য একটি চাকরি।

বি. এ. পরীক্ষার এক বছর দেরি। এখন থেকেই খবরের কাগজ দেখে দরখাস্ত পাঠাতে শুরু করেছিল। জবাব বড় একটা আসত না। একদিন একখানা সরকারী খাম এসে হাজির। খুলে, খুশী হবার কথা, কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। অথচ দরখাস্ত যেদিন করে তারপর থেকে আশায় আশায় দিন গুনেছে। তার অঙ্কুর যখন দেখা দিল, ভিতর থেকে আর চাড় এল না।

শেষকালে পুলিস হবে! পুলিসের দারোগা!

সবে তখন পুলিস বিভাগে একটি নারী-বাহিনী গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার। তার মধ্যে থাকবে কয়েকজন সাব-ইনস্‌পেক্টর এবং অ্যাসিট্যাণ্ট সাব-ইনস্‌পেক্টর। দরখাস্ত চাওয়া হয়েছে অন্ততঃ আই. এ. পাস, দীর্ঘাঙ্গী সবলদেহী তরুণীদের কাছ থেকে। দীপালী যেমন সব জায়গায় দেয়, তেমনি এখানেও একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দিয়েছিল। ইণ্টারভিউ-এর ডাক এসে গেছে।

ইতিমধ্যে 'নারীপুলিস' কথাটা হাসি-ঠাট্টা এবং কোথাও বিরূপ সমালোচনার খোরাক যোগাতে শুরু করেছিল। খবরের কাগজে কার্টুনও দেখা দিয়েছিল দু'চারটা। রক্ষণশীল মহলে প্রচুর ক্ষোভ। একটি ভদ্রঘরের মেয়ে পুলিসের পোশাক পরে চোর-ডাকাত ধরতে বেরোবে! দৃশ্যটাই অশোভন। তাছাড়া পুলিস হলেও সে মেয়ে, যুবতী মেয়ে। তাকে রক্ষা করবে কে? রক্ষিকা যদি ভক্ষিতা হয়, তখন?

বাবা-মাকে না জানিয়ে ইণ্টারভিউ দিয়ে এল দীপালী। সংসারের

দিকে চেয়েই মনস্থির করে ফেলল। বাবা আর বেশী দিন নেই। ছোট ভাই দু'টো স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি। এদিকে চাকরির যা বাজার! এত দরখাস্ত তো পাঠাল। সাড়া বলতে এই একটি। একে অবহেলা করা যায় না।

ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে অনেকটা ভরসা পেল। তার মত আরো মেয়ে এসেছে। সকলেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। যেমন তেমন একটা চাকরি চাই। ভেঙে-পড়া কিংবা ভেঙে পড়তে উদ্যত সংসারকে তুলে ধরার মত যাহোক একটা খুঁটি। অশক্ত বাপ-মা, অক্ষম কিংবা অপোগণ্ড ভাইবোনদের অভাবের গ্রাস থেকে কোনো-রকমে বাঁচাবার জন্যে কোনো একটা অবলম্বন। তার চেহারা নিয়ে বাছবিচারের অবকাশ কোথায়? মাস গেলে কয়েকখানা নোট। তার অঙ্কটাই শুধু দেখতে হবে। এখানে যেটা পাওয়া যাবে নেহাত মন্দ নয়। মাইনে, ভাতা, বাড়ি-ভাড়া, সস্তা দরে রেশন, সব মিলিয়ে তাদের মত একটি ছোট্ট সংসারকে টেনে-টুনে চালিয়ে নেওয়া যাবে। তাহলে আর কী চাই?

ইণ্টারভিউ-এর ধরন দেখে দীপালীর মনে হল চাকরীটা হয়ে যাবে। নারী পুলিসের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টর। পোশাকের একটা ধারণা পাওয়া গেল। খাকী ট্রাউজার, তার উপরে একই রং-এর বুশ-সার্ট, কোমরে বেল্ট, টেনে বাঁধা খোঁপার উপর টুপি, পায়ে কালো শু। কি কিম্ভূত না দেখাবে! ছবিটা মনে মনে কল্পনা করতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। যে যুগে এসে জন্মেছে, মেয়ের মেয়েত্ব আর রইল না।

ইণ্টারভিউ যিনি নিচ্ছিলেন, বোধহয় কোনো উঁচুদরের পুলিস অফিসার, কিন্তু কথাবার্তায় ভদ্র, ব্যবহারে মোলায়েম, হাসিমুখে প্রায় ঐ ধরনের কথাই বলেছিলেন—আপনারা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করবেন, অথচ বলবেন, তোমাদের আর আমাদের ডোমেইন আলাদা, তোমরা রোদে পোড়ো, বৃষ্টিতে ভেজো, আমরা ঘরে বসে সাজি আর সাজাই—তা কেমন করে হবে? আপনি

হয়তো বলবেন, কেন, আমরা কি বাইরে বেরোচ্ছি না? চাকরি-বাকরি করছি না? করছেন। কিন্তু তার সীমানাটা বড় ছোট। ডাক্তারি, মাস্টারি, নার্সিং কিংবা বড়জোর কেরানী-গিরি। ওটা আরো বাড়াতে হবে।

আরেকজন বললেন, সেটা এমন কিছু নতুন নয়। আমরা যাদের 'নিম্ন শ্রেণী' বলি, হাটে-বাজারে, ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় যারা গতর খাটিয়ে খায়, তাদের মেয়েরা তো বরাবরই পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমান তালে কাজ করে আসছে। সেই একই জিনিস এবার দেখা দিচ্ছে আরেকটু উপর স্তরে। যুগের প্রয়োজনেই দিচ্ছে।

দীপালী মনে করল বাবা-মাকে আগে থাকতে একটু আভাস দিয়ে রাখা দরকার।

ভবনাথের বুকে সর্দি বসেছিল। সে-ই কলেজ থেকে ফিরে রোজ খানিকটা করে পুরনো ঘি মালিশ করে দেয়। সেদিন খানিকক্ষণ দেবার পর একটু সুস্থ বোধ করতে তিনি বললেন, এবার থাক মা। আর কত কষ্ট করবি আমার জন্যে?

—"কষ্ট কিসের? সামান্য একটু মালিশ।" কয়েক সেকেণ্ড থেমে বলল, এরপর একটা চাকরি-বাকরি পেয়ে গেলে, তখন তো তোমার কাছে একটু বসতেও পাব না।

ভবনাথ চুপ করে রইলেন। মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া পড়ল। তিনি জানতেন, দীপালী চাকরির চেষ্টা করছে। সেটা তাঁর একেবারেই ইচ্ছা নয়, কিন্তু সংসারের দিকে চেয়ে বাধা দিতেও পারেন নি।

দীপালীই আবার কথা পাড়ল—হয়তো শীগগিরই একটা পেয়ে যাব।

—কী চাকরি?—এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না ভবনাথ।

—অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছি। একটা নিশ্চয়ই লেগে

যাবে!···আজকাল তো সব রকম চাকরিই পাচ্ছে মেয়েরা! পুলিস পর্যন্ত হচ্ছে।

—পুলিস! হ্যাঁ, কাগজে দেখছিলাম বটে। নারী-পুলিস! ঝাঁটা মার' দেশের কপালে! যেমন হয়েছে আমাদের গভর্নমেণ্ট, তেমনি হয়েছে মানুষগুলো।

—চাকরিগুলো কিন্তু মন্দ নয় বাবা। আমি খবর নিয়েছি।

ভবনাথ চমকে উঠলেন। চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলেন স্ত্রীকে, ওগো শুনছ—

দীপালীর মা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকতেই বললেন, তোমার মেয়ে কি বলছে শোনো—

মা জিজ্ঞাসু চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। সে চুপ করে রইল। ভবনাথই বললেন, তোমার মেয়ে পুলিস হবে। নারী-পুলিস!

মা কিন্তু চমকেও উঠলেন না, ভয়ও পেলেন না। বেশ সহজভাবে বললেন, তা, কি করবে? পুলিস-ফুলিস যাহোক একটা কিছু হতে তো হবেই।

ভবনাথের মুখে আর কোনো কথা সরল না। স্ত্রীকে তিনি এতটুকু থেকে চেনেন। কথাগুলো যে তার অন্তরের কথা নয়, তাঁর চেয়ে কে বেশী জানে?

চিঠি সত্যিই এসে গেল। বাড়ির সকলেই জানল। কেউ কিছু বলল না। ভাই দুটো দিদিকে এড়িয়ে চলল। মা তাদের গোপনে সাবধান করে দিলেন, আশপাশের লোকগুলো যেন না জানতে পারে।

চাকরিতে যোগ দিতে যেদিন বেরোবে, মাকে প্রণাম করল দীপালী। তিনি ওর মাথায় হাত রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বাবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, ভাইয়েরা বেশ কিছুটা আগেই স্কুলে বেরিয়ে গেছে।

পুলিস হলেও অফিসের কাজ। লালবাজারে দশটা পাঁচটা ডিউটি। কিন্তু আসতে হয় ইউনিফর্ম পরে। ফলে যেখানে সেখানে 'ট্রাফিক জ্যাম্'। শুধু ভিড় নয়, তার ভিতর থেকে নানা স্বরের রসিকতা, বিদ্রূপ।

দীপালী বেরোত তার সাধারণ পোশাকে। বৌবাজারে এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানে থাকত সরকারী খাকী সাজ। সেজে নিয়ে কাজে যেত, আবার ফিরে এসে ওগুলো ছেড়ে রেখে ট্রেন ধরতে ছুটত।

এরই মধ্যে আরো কয়েক লাখ উদ্বাস্তু এসে ছেয়ে ফেলেছে কলকাতা আর তার আশপাশ। খালি জায়গা পেলেই রাতারাতি জবর-দখল। জমির মালিকের কানে যখন খবরটা পৌছল, তার আগেই সমস্ত জায়গা জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে সারি সারি টিন-টালি-চাটাই-হোগলার চালা। ভিতরে ঘরকন্নার কলরব। বাইরে নানা রকম ব্যস্ততা—মাপ-জোখ, রাস্তাঘাট তৈরির আয়োজন, কমিটি বৈঠক। উড়ে এসে জুড়ে বসার কোন লক্ষণ নেই।

মালিক যদি কোর্টে যান, যথারীতি এবং যথাকালে ইজেক্ট্‌মেণ্ট অর্থাৎ উচ্ছেদের অর্ডার বেরোবে। কিন্তু উচ্ছেদ করবে কে? কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে-সব মালিক সরকারী মহলে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তাদের বেলায় হয়তো পুলিসী সাহায্য মঞ্জুর হবে। কিন্তু পুলিস এলেই পুরুষেরা প্রায়ই গা-ঢাকা দেয়, এগিয়ে আসে মেয়েরা। কোথাও কোথাও রীতিমত নারী-বাহিনী, এবং বাক্যবাণই তাদের একমাত্র অস্ত্র নয়, তার সঙ্গে অবাধে চলতে থাকবে দা, বঁটি, নোড়া, কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি কিংবা ইট-পাটকেল। অর্থাৎ পুরুষ পুলিসের হটে আসা ছাড়া অন্য পথ নেই।

কিন্তু সরকার তো আর হটে আসতে পারেন না। আইনকে বলবৎ করা তার প্রাথমিক দায়িত্ব। ল' মাস্ট্ বি এনফোর্সড্। অতএব ডাক পড়ল নারী-পুলিসের।

টালিগঞ্জের দিকে কার একটা পোড়ো বাগান দখল করে বসেছিল

উদ্বাস্তুরা। তাদের তুলতে হবে। সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিন্তু তেজ প্রচুর। একটি মাঝারি গোছের পুলিস ফোর্স পাঠাতে হয়েছে। বন্দুকও আছে কিছু, অফিসারদের কোমরে রিভলবার। তিনটি মেয়ে অফিসার রয়েছে ঐ সঙ্গে। তারাও সশস্ত্র। উদ্দেশ্য অবশ্য মারধোর নয়, যে-সব মেয়েরা তেড়ে আসবে তাদের ভিতর থেকে কিছু গ্রেপ্তার।

পুলিসের সাড়া পেয়ে সারা কলোনীতে চেঁচামেচি, ছুটোছুটি লেগে গেল। একদল মেয়েই বেশি সোচ্চার। ঠিক সামনে তাদেরই জাতের পুলিস দেখে প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গেল। তারপর শুরু হল গালাগালি, টিটকারি। 'লজ্জা করে না।' 'পুলিস সেজে রাস্তায় বেরিয়েছিস।' 'ঘরে কি তোদের মা বোন নেই?'···ইত্যাদি, এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু, যা শ্রাব্য নয়।

ওসব গায়ে মাখতে গেলে চলে না। মেয়ে অফিসারেরা চালা-গুলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

'দীপু!'

দীপালী চমকে উঠে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ কাউকে ঠাহর করতে পারল না। কিন্তু এ স্বর তো কোনোদিন ভুলবার নয়।

ঠিক সামনে তক্তপোষের উপর যে মহিলাটি বসে ছিলেন তাঁকেও প্রথমটা চিনতে পারল না। পরনে ছেঁড়া থান, মাথায় একরাশ রুক্ষ পাকা চুল, কোটরে ঢোকা চোখ, তার ভিতরে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। সারা দেহ কঙ্কালসার। কেমন একটা ভাঙাভাঙা গলা শোনা গেল—কেন যাব, কোথায় যাব? ওখান থেকে মেরে ধরে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিল, এখান থেকেও তাড়িয়ে দেবে? আমি যাব না।

এবার চিনল দীপালী। সারা অঞ্চলে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন বড়বাড়ির বড়গিন্নী।

'অ্যারেস্ট হার!'···আবার চমকে উঠল দীপালী। কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। উপরওয়ালার হুকুম এক মুহূর্তে তাকে বাস্তবের

মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। সারা দেহে যেন একটা তিক্ত স্রোত বয়ে গেল। নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ইচ্ছা হল এই খাকীর খোলশটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এখান থেকে। পরক্ষণেই মনে পড়ল, বাবা আর উঠতে পারছেন না, এ-জীবনে আর পারবেন না।

পিছন থেকে আবার গর্জে উঠল সেই স্বর—হোয়াট আর ইউ ডুইং! টেক্ হার টু দি ভ্যান্।

হাতদুটো বাড়িয়ে সেই অস্থিচর্মসার বৃদ্ধাকে জাপটে ধরল দীপালী এবং টানতে টানতে নিয়ে চলল অদূরে অপেক্ষামান পুলিস-ভ্যানের দিকে।

প্রস

দার্জিলিং যাওয়া কেয়ার এই প্রথম নয়। এর আগে দুবার ঘুরে এসেছে। প্রথম গিয়েছিল বাবা-মার সঙ্গে, পরের বার দিদি-জামাই-বাবুর সঙ্গে। দুবারই শিলিগুড়ি থেকে মোটরে। কেয়ার ইচ্ছা ছিল রেলে যাওয়া, বিশেষ করে প্রথমবার। তখন স্কুলে পড়ে। ছোট ছোট পালকির মত গাড়িগুলো দেখেই ইচ্ছা করছিল, 'চড়ে বসি'। বড়রা রাজী হননি। বাবা বলেছিলেন, দূর, ওটা আবার রেল নাকি! গরুর গাড়িও ওর চেয়ে আগে যায়।

কেয়া বুঝতে পারেনি, তাড়াতাড়ি যাওয়াটাই কি বড় হল? আস্তে আস্তে যাওয়া মানে দেখতে দেখতে যাওয়া। ঐ দেখাটাই আসল। সে শুনেছিল, রেলে বসে হিমালয়কে যেমন দুচোখ ভরে, সারা প্রাণ ভরে দেখা যায়, মোটরে তা মোটেই সম্ভব নয়। তাছাড়া এই রেল লাইনটাই এক বিস্ময়। এঁকে বেঁকে, উঁচুতে উঠে, নীচে নেমে, কখনো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার পিছনে হটে এসে গাড়িগুলো যখন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলে, সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আরেকটা জিনিস ভারী তাজ্জব মনে হয়েছিল কেয়ার। ঐ খুদে এঞ্জিনগুলোর হুঙ্কার। আকারে ছোট হলে কি হয়, প্রতাপ প্রবল। হিং টিং ছট্‌এর সেই লাইনটা মনে পড়ে গিয়েছিল—এতোটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ হয়!

এবার সে একা যাচ্ছে দার্জিলিং। রেলেই যেতে হবে শিলিগুড়ি থেকে। একটা গোটা মোটরের অনেক ভাড়া। শেয়ারেও যাওয়া যায় না কতগুলো অচেনা লোকের সঙ্গে। কেয়ার খুশী হবার কথা, কিন্তু হল না। মনে তার সুখ নেই। এবারকার যাওয়া আনন্দের যাওয়া নয়, বাধ্য হয়ে যাওয়া।

একা যাওয়াটা মার বিশেষ পছন্দ নয়। বড় ছেলেকে

বলেছিলেন, দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে ওকে রেখে আয় ঠাকুরঝির কাছে।

"কী যে তুমি বল মা," ঝাঁজিয়ে উঠেছিল সন্দীপ, "ওর বয়সী মেয়েরা একা একা অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে অ্যামেরিকা চলে যাচ্ছে, আর ও এই ঘরের পাশে দার্জিলিং যেতে পারবে না? কচি খুকী আছে নাকি এখনো?"

দাদা ঠিকই বলেছে। কেয়া আর কচি খুকী নেই, বড় হয়েছে। এবার বাইশ বছরে পড়ল। লেখাপড়াও শিখেছে কিছুটা। বি. এ. পাস করেছে গতবার। বড় হয়েছে বলেই তার মধ্যে একটা বড় জিনিস গড়ে উঠেছে—তার নাম মন। একটা স্বাধীন মতামত দেখা দিয়েছে তার, একটা নিজস্ব ইচ্ছা বা অনিচ্ছা। সে কথা কেউ বোঝে না, বুঝতে চায় না। সেখানে সব অভিভাবক সগোত্র, সমমত—'ও ছেলেমানুষ, ও কী বোঝে?' দাদাও সেই দলে।

সন্দীপ যখন তাকে একান্তে পেয়ে বলল, কি রে ভয় পাচ্ছিস নাকি? কেয়া জবাব দিল না, মুখ ফিরিয়ে নিল। তার বিশ্বাস, দাদা একটু চেষ্টা করলে তার যাওয়াটা আটকাতে পারত। বোনের এই অভিমানটুকু বুঝতে পারল সন্দীপ, কিন্তু কোনো ভরসাই দিল না। অসহায় ভাবে বলল, বাবাকে তো জানিস, একবার যখন জিদ ধরেছেন—। এখনি এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ঘুরে আয়; তারপর দেখা যাবে।

কেয়া জানে, দাদার এই 'দেখা যাবে'র কোনো মূল্য নেই।

পিসেমশাই বুড়ো মানুষ। ষ্টেশনে আসতে পারবেন না। কিন্তু পিসীমাকে আশা করেছিল কেয়া। তিনিও নেই। এদিক ওদিক যখন দেখছে, একটি পনর-ষোলো বছরের মেয়ে এসে তাকে প্রণাম করল। কেয়া তার হাত ধরে তুলে বলল, রূপা না? এত বড় হয়ে গ্যাছ! একেবারে শাড়িটাড়ি পরে—প্রথমটা তো চিনতেই পারিনি।

"অন্য দিন পরি না। আজ আপনি আসছেন—"

"ও, আমার অনারে? তা, বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে। একেবারে ফুল-ফ্লেজেড্ লেডি।"

রূপা খুব খুশী। নিজের সামনেটা পিছনটা দেখে শাড়ির ভাজ-টাজগুলো রিভাইজ এবং ঠিকঠাক করে নিল। তারপর কেয়ার খুব কাছে সরে এসে চুপি চুপি বলল, আপনি না—? ভী-ষণ সুন্দর হয়েছেন দেখতে। মিস্টার ব্যানার্জি একবার দেখেই পছন্দ করে ফলবেন।

কেয়ার মুখের উপর একটি ম্লান ছায়া পড়ল। রূপা অতশত লক্ষ করল না। বলল, এরই মধ্যে দুদিন এসে ঘুরে গেছেন।

কেয়া এতটুকু মেয়ের কাছে ধরা পড়তে চাইল না। মুখে হাসি টেনে এনে বলল, তাই নাকি?

"হ্যাঁ, আপনার খোঁজে।"

"আমার খোঁজ কেন, তোমার খোঁজেও তো হতে পারে।"

"ধ্যেৎ; আমি কি বলেছি জানেন?"

"কী?"

"বলেছি, কেয়াদির আসতে এখনো অনেক দেরি আছে। শুনে ভদ্রলোকের মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল।'

বলে, খিল খিল করে হেসে উঠল।

কেয়া বুঝল, মেয়েটি বয়সের তুলনায় একটু বেশী পাকা। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বলল, পিসীমা, পিসেমশাই ভালো আছেন?

রূপা বলল, জ্যাঠাইমা তো এখানে নেই। গোরখপুর গেছেন, ওঁর কে এক দিদি আছেন, তাকে দেখতে। তার অসুখ কিনা। আর জেঠু চুপচাপ শুয়ে আছেন।

রমানাথ রায়ের বাড়িটা স্টেশন-লেভেল থেকে অনেক নীচে। চারদিকে বাড়িঘরও কম। একটা নেপালী বস্তি আছে কিছুটা দূরে। জায়গাটা সস্তায় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া অতটা প্লেন জমি দার্জিলিংএ দুর্লভ। বাড়িটা ছোট্ট, খানচারেক ঘর। তার বেশী দিয়ে হবেই বা কী? নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী। রূপা ওঁদের এক গরীব

আত্মীয়ের মেয়ে। মা নেই, ওঁরাই মানুষ করেছেন, একেবারে মেয়ের মত। স্কুলে উপরের দিকে পড়ে। বেশ চালাক-চতুর, কাজেকর্মে চৌকশ। তাই তো বৃদ্ধ রুগ্ন স্বামী আর সংসার সব ওর হাতে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পেরেছেন মিসেস রায়।

এখান থেকে বাজার বেশ দূরে, অনেকখানি চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। তবে এঁদের বড় একটা দরকার হয় না। বস্তি থেকেই প্রায় সব কিছু পান—মাটন, ডিম, দুধ, ঘি করবার জন্যে ঢেলা মাখন। বাড়ির চারধারে বড় কম্পাউণ্ড, সেখান থেকে আসে তরিতরকারি। ওঁদের আর প্রয়োজন কতটুকু? বাকীটা বিক্রী হয়। মালী আছে, সে-ই সব করে। তাছাড়া একটি চাকরও আছে, আর আছে একটি অনেক দিনের নানী (ঝি), আপনজনের বাড়া।

পরদিন বিকেলেই প্রদ্যোৎ ব্যানার্জি এসে উপস্থিত। মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেল থেকে অনেকখানি উৎরাই। কানপুরে একটা মস্ত বড় কাপড় কলের বড় চাকরে। টেক্সটাইল এঞ্জিনিয়ারিংএ বিলিতি ডিগ্রী আছে, তার উপরে ল্যাঙ্কাশায়ারের ট্রেনিং। মিসেস রায়ের ছেলেবেলাকার সইএর ছেলে। তিনিই লিখেছিলেন, তুমি তো ভাই দার্জিলিংএ আছ। বাংলা দেশ, বেড়াতেও যায় অনেক লোক। দেখো তো ভাই একটি ভালো ঘরের ভালো মেয়ে পাও কিনা আমার পদুর জন্যে।

মিসেস রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, আর দেখতে হবে কেন? আমাদের কেয়াই তো রয়েছে। সব দিক দিয়ে মানিয়ে যাবে।

দেখাশুনোর ব্যাপারটা কোথায়, কেমন করে ব্যবস্থা করা যায়, এই নিয়ে যখন কথাবার্তা চলছে, আপনা থেকেই তার সুযোগ জুটে গেল। তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে এল প্রদ্যোৎ। মা বলেছিলেন সই এর বাড়িতে উঠতে! মিসেস রায়ও খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু প্রদ্যোতের সেটা মনঃপূত হল না।

হোটেলেই উঠল। মিসেস রায় দাদা বৌদিকে চিঠি লিখে দিলেন, কেয়াকে যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা স্বভাবতই এ সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। কোথায় পাওয়া যাবে এরকম ছেলে? যেমন কৃতী, তেমনি দেখতে শুনতে (কেয়ার পিসীমা ছেলের একটা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন), তেমনি জানাশুনোর মধ্যে। কেয়াকে যদি চোখে লেগে যায়, খরচপত্রের দিকে তাঁরা কিছুমাত্র কার্পণ্য করবেন না।

কেয়া এম. এ.-তে ভর্তি হয়েছিল। প্রথমটা ক্লাস কামাই, পরে শরীর খারাপ—এই ধরনের দু-একটা ওজর দেখাবার চেষ্টা করেছিল। বাবা সব নাকচ করে দিয়েছেন।

প্রদ্যোৎ আসতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল রূপা। দুচোখে একটি বিশেষ ইঙ্গিত করে বলল, এসে গ্যাছেন।

"কে?" বুঝতে পারলেও না বুঝবার ভান করল প্রদ্যোৎ।

রূপা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, খবর পেলেন কী করে? বুঝেছি, একেই বলে ইনটিউশন, আমাদের হেডমিস্ট্রেস বলছিলেন সেদিন।···বসুন, একটু দেরি হবে।

রমানাথবাবু দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রূপাকে ডেকে বললেন, ওদের চা-টা দে, আর বেলা পড়বার আগেই একটু বেড়িয়ে নিয়ে আয়।

প্রদ্যোৎ আর কেয়ার দিকে ফিরে যোগ করলেন, কাছেই একটা ছোট্ট ন্যাড়া পাহাড় আছে, যেখানে দাঁড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘার এমন একটি ভিউ পাবে, যা অবজারভেটরী হিল্ বা অন্য কোন জায়গা থেকে পাবে না। আমি যখন সুস্থ ছিলাম রোজ গিয়ে বসে থাকতাম সেখানে। দার্জিলিংএর সব চেয়ে বড় সম্পদ, সব চেয়ে বড় মহিমা কাঞ্চনজঙ্ঘা। খুব ভালো সময়ে এসেছ তোমরা। মেঘ-টেঘ তেমন নেই। সবটাই স্পষ্ট দেখতে পাবে। যাকে বলে নিরাবরণ রূপ।

তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। রূপা বলল, কোনদিকে যাবেন? জেঠুর ঐ ন্যাড়া পাহাড়ে না গেলে কিন্তু উনি মনে মনে কষ্ট পাবেন।

তবে যদি না গিয়ে বলে দেন, বাঃ কী সুন্দর! এ রকমটা আর দেখিনি, তাও পারেন।

কেয়া বলল, না, না, তা কেন বলবো? চল না, দেখে আসি!

প্রদ্যোতের ইচ্ছা ছিল শহরের দিকে ওঠা। বটানিক্যাল গার্ডেন, ম্যাল, অবজারভেটারী হিল। সেটা চেপে গিয়ে বলল, বেশ তো।

ন্যাড়া পাহাড়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রূপা বলল, আরেকটু নীচে নামলেই শ্মশান। যাবেন নাকি?

"না, না, শ্মশানে গিয়ে কী হবে? ওটা আবার একটা বেড়াবার জায়গা নাকি?" বেশ জোরের সঙ্গে আপত্তি জানাল প্রদ্যোৎ।

রূপা মুখ টিপে হেসে বললে, ভয় পাচ্ছেন বুঝি?

"ভয় পাবো কেন? ভয়-টয় আমি পাই না। ওসব জায়গা আমার ভালো লাগে না। কখনো যাইনি।

কথার স্বরে রূপার মনে হল, ভদ্রলোক সত্যিই একটু ভয় পেয়েছেন।

চারদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। দার্জিলিং পুরো শহর হয়ে গেছে। মানুষের হাতে মার খেয়ে খেয়ে প্রকৃতি সেখান থেকে পলায়মানা। কোথায় গেছে বার্চ হীলের সেই শান্তগম্ভীর নিথর-নির্জন বৃক্ষশোভা? বড় বড় ইমারতে ছেয়ে গেছে গোটা অঞ্চল, আর তার মধ্যে কিলবিল করছে মানুষ। এতদূরে জন্যারণ্যের চাপ এসে পৌঁছয়নি। তাই অরণ্যের শ্যামল রূপটি এখনো অনেকখানি অক্ষত।

বেশ ভালো লাগছিল কেয়ার। দুচোখ মেলে দেখতে দেখতে চলেছিল। একটা মোড়ে এসে দুধারে গাছপালা ঘেরা একটা সরু পথ দেখিয়ে বলল, এ রাস্তাটা কোথায় গেছে রূপা?

"ওটা গেছে কালিম্পংএর দিকে। পাহাড়ীরা ওখান দিয়ে শর্টকাট করে। দু ধারে হাজার রকমের গাছপালা, আগাগোড়া মস্ দিয়ে মোড়া। ভারী মজা লাগে দেখতে। গাছগুলো যেন শীতের ভয়ে সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

"তাই নাকি! চল তো দেখি কিরকম।"—উৎফুল্ল হয়ে উঠল

কেয়া। প্রদ্যোতের মুখের ভাব আর চলার ধরন দেখে মনে হল, তার মোটেই ইচ্ছা নেই ঐ জঙলা পথে ঢুকতে। কিন্তু 'না' বলাটা সৌজন্যে বাধে বলেই বোধ হয় এগিয়ে চলল।

কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল পথটা বেঁকে গেছে, সামনের দিকটা বন্ধ। রূপা বলল, বছর দেড়েক আগে ভীষণ ল্যাণ্ড্স্লিপ হয়েছিল এখানটায়। একটা গোটা পাহাড় ধসে পড়ে পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। বেশ কিছু লোকও চাপা পড়েছিল।

"ল্যাণ্ড্ স্লিপ!" চমকে উঠল প্রদ্যোৎ। "তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই।"

রূপা হেসে উঠল। তারপর সাহস দেবার ভঙ্গিতে বলল, ভয় নেই আপনার। ল্যাণ্ড্স্লিপ হয় বর্ষাকালে। এ সময়ে হবে না।

গাছ থেকে টুপ করে একটা কি পড়ল ওদের সামনে। প্রদ্যোৎ বলে উঠল, কী ওটা?

"জোঁক।"

"জোঁক! কি সর্বনাশ! এ কোথায় নিয়ে এসেছ! গাছের ওপর থেকে জোঁক পড়ে!"

"তাই তো পড়ে। সেঞ্চল লেক্-এ গিয়ে দেখুন না। এখানে তো একটা দুটো। ওখানে জোঁকের বৃষ্টি হচ্ছে।"

জোঁক জিনিসটা কেয়ারও বিশেষ পছন্দ নয়। সে বলল, চল, এবার ফেরা যাক।

ফিরে এসে আরেক দফা চা। তারপর ওদের দুজনকে ড্রইরুমে রেখে চলে গেল রূপা। ওদিকে তার অনেক কাজ।

রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়ল। খাওয়া দাওয়া মিটে গেলে রূপা বলল, এখনি যেন কম্বল মুড়ি দেবেন না। আমি একটু পরেই আসছি।

"না, না, কম্বল মুড়ি দেবো কী? এসো না, তোমার যখন খুশি।"

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে ঝুপ করে কেয়ার পাশে বসে

পড়ল রূপা। দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে স-ব বলতে হবে।

"কী স-ব!" বিস্ময়ের সুর কেয়ার।

"দেখুন, আমার চোখকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি।"

"কী দেখেছ তুমি?"

"আপনি আগাগোড়া গোমড়া মুখ করে বসেছিলেন। আর ভদ্দরলোকের কী চেষ্টা একটু হাসাবার জন্যে! কথাবার্তাও কিচ্ছু বলেননি আপনি। শুধু 'হুঁ', 'হাঁ', আর 'না'!"

"তাছাড়া আর কী বলবো?

"তাছাড়া আর কী বলবো!' আমাকে বুঝি ছেলেমানুষ পেয়েছেন? না, সত্যি কেয়াদি, বলুন না। এঁকে আপনার পছন্দ নয়, বুঝতে পারছি। তার মানে, আরেকজন কেউ আগে থেকেই,— তাই না?"

"ওসব বাজে কথা থাক। এসো, দার্জিলিং এর গল্প করি।"

রূপা খানিকটা সরে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উদাস সুরে বলল, থাক, আপনাকে আর বিরক্ত করবো না! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি যাই।

"অমনি বুঝি রাগ হল মেয়ের!" বলে ওর হাতটা ধরে ফেলল কেয়া। খানিকক্ষণ কি ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, সে সব কথা জেনে তুমি কী করবে?

"দেখি কিছু করতে পারি কিনা।"

সেরকম কোন আশা অবশ্য ছিল না কেয়ার। কিন্তু তার মন তখন এমন ভারাক্রান্ত যে কারো কাছে সে ভারের কিছুটা নামিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। এই মেয়েটি তাকে ভালবাসে। তারও ওকে শুরু থেকেই ভাল লেগেছিল। তাই যদিও ও সত্যিই ছেলেমানুষ এবং দুজনের পরিচয় অতি সামান্য, তবু ওর কাছেই জীবনের কয়েকটি গোপন পাতা খুলে ধরল। রূপা যা আন্দাজ করেছিল, আরেকজনের

আবির্ভাব ঘটেছে তার ভাগ্যাকাশে, কিন্তু ভাগ্য তাদের দিকে মুখ তুলে চাইছে না। উভয় তরফেই কথা দেওয়া হয়ে গেছে। বাধ সাধছেন বড়রা, যা হয়ে থাকে, বিশেষ করে বাবা। তাঁর ইচ্ছা তাঁর মনোমত একটি 'ভালো' পাত্র। এর চেয়ে 'ভালো' আর কে আছে?

রূপার মুখে প্রবীণা অভিভাবিকার গাম্ভীর্য। সেই সুরেই বলল, পাত্তর হিসেবে ওঁরা তাকে নিরেস মনে করছেন কেন? কাজ-টাজ কিছু করেন না বুঝি?

"করে; একটা প্রাইভেট কলেজে পড়ায়।"

"প্রফেসর! সে তো খুব ভালো চাকরি। ইনিই বা কী? ভারী তো একজন এঞ্জিনিয়ার!"

"তুমি তো বলছ ভালো চাকরি। ওঁরা দেখছেন, সে তিন অঙ্ক, ইনি চার।"

"তার মানে?"

"মানে, সে ছ'শ টাকা মত পায়, আর এঁর মাইনে হাজারের ওপর। ইনি প্রায় ছ ফুট, আর সে বেচারা পাঁচ ফুট ছয়। সে যে সবদিকেই খাটো।"

"দেখতে?"

কেয়া চোখ বুজল। শিয়ালদ স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে দূর থেকে দেখা নিশীথের শ্যামবর্ণ শুকনো মুখখানা স্মরণ করে তার মুখেও একটা করুণ মালিন্যের ছায়া পড়ল। ধীরে ধীরে বলল, না, দেখতেও সে এমন কিছু অপরূপ নয়।

"আর, ইনিই বা কি আহামরি?" ঝঙ্কার দিয়ে উঠল রূপা, "সাদা, ফ্যাকাশে রং, ঘোড়ার মত মুখ, কামিয়ে কামিয়ে গাল দুটো কালচে ধরে গেছে, খাঁড়ার মত নাক, শণের মত একমাথা চুল, গায়ে মাংস নেই, এদিকে এই লম্বা তালগাছ! আমার তো একটুও ভাল লাগে না ভদ্দরলোককে।"

ঠোঁট বেঁকিয়ে, কপাল কুঁচকে পাকা গিন্নীর মত রায় দিয়ে দিল।

মিসেস রায় ফিরে এলেন। সঙ্গে তাঁর এক ভাই, বয়সে প্রৌঢ়, আর একটি যুবক ভাইপো। কেয়াকে দেখে খুব খুশী! চিবুক ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কন্যাসমা ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখখানা ভালো করে দেখে আরো খুশী হয়ে উঠলেন। স্বগতোক্তির মত বললেন, পছন্দ অমনি না করলেই হল!

রূপা ছিল কাছে দাঁড়িয়ে। বলে উঠল, আগের চেয়ে আরো কত সুন্দর হয়েছে কেয়াদি। স্টেশনে প্রথম দেখে আমার তো তাক লেগে গিয়েছিল।

"হবে না? কী রকম সুন্দরের বংশ!"

কেয়ার দিকে চেয়ে আড়ালে চোখ টিপল রূপা। অর্থাৎ এই ফাঁকে নিজের সম্বন্ধেও একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব প্রকাশ করলেন জ্যাঠাইমা। তা তিনি পারেন। যৌবনে তিনিও কেয়ার মত কেন বোধ হয় তার চেয়েও রূপসী ছিলেন।

রূপাকে আলাদা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রদ্যোৎ এসেছিল কিনা, কদিন এসেছিল, ওদের দুজনের আলাদা দেখাশুনো হয়েছে কিনা, তাকে যথেষ্ট খাতির-যত্ন করা হয়েছে তো? ইত্যাদি। রূপা কেয়ার দিকটা বাদ দিয়ে বাকী সবটুকু জানিয়ে দিল জ্যাঠাইমাকে।

খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়েই চাকর সঙ্গে করে বাজার করতে বেরোলেন মিসেস রায়। ঐ সঙ্গে মাউণ্ট্ এভারেস্টেও যাবেন। প্রদ্যোৎকে বলে আসবেন, পরদিন এখানে লাঞ্চ খাবে। তাঁর বেরোবার ঘণ্টা তিনেক পরে প্রদ্যোৎ এসে হাজির। রূপা জিজ্ঞাসা করল, জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

"না তো। তিনি ফিরেছেন নাকি?"

"আপনার হোটেলেই তো গেলেন।"

"আমি লাঞ্চের পরেই বেরিয়ে পড়েছি। বড্ড মিস্ করা গেল।"

"তাতে কী হয়েছে? সন্ধ্যার আগেই তো ফিরছেন। ততক্ষণ—", বলে, চাপা হাসির সঙ্গে চোখে একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল। তারপর

জুড়ে দিল, "এখ্খনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।...হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনাকে বলা দরকার।"

শেষবাক্য দুটি বলবার ধরনটা এমন সিরিয়াস অর্থাৎ গুরুগম্ভীর যে প্রদ্যোৎ শুনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল। বাড়িতে আছেন রামনাথবাবু, তিনি তো শয্যাগত। আর আছে কেয়া। অতিথি দুজন বেরিয়েছেন শিকারে। ওদের বাড়ি থেকে অনেকখানি নীচে কোথায় একটা জঙ্গল আছে। পাখি-টাখি পাওয়া যায়। এখানে হঠাৎ এসে পড়বার মত কেউ নেই। তবু ভিতর দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল রূপা। প্রদ্যোৎ বসেছিল সোফায়। তার ঠিক সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একটুখানি কি ভাবল। মুখখানায় একটি শোকের ছায়া ফুটিয়ে তুলল। তারপর করুণ দুটি চোখ তুলে বলল, ব্যাপারটা বড় স্যাড্। সেদিন সেই ল্যাণ্ড্স্লাইডের কথা বলছিলাম না আপনাকে? তাতে অনেক লোক চাপা পড়ে মারা যায়। আমার জ্যাঠাইমার ভাই আর ভাইপো ছিলেন তার মধ্যে।

"বল কী!" চমকে উঠল প্রদ্যোৎ।

"ওঁরা শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। আর ফিরে আসেননি। তিনদিন পরে মাটি কেটে ডেড্ বডি বের করে নীচের ঐ শ্মশানে নিয়ে দাহ করা হয়। আজ থেকে ঠিক দেড় বছর আগে।"

দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ ফেরাল রূপা। তারপর আবার ফিরে গেল তার কাহিনীতে—"সেই থেকে জ্যাঠাইমা যেন কেমন হয়ে গ্যাছেন। বড্ড ভালবাসতেন ভাই আর ভাইপোকে। নিজের ছেলেপুলে নেই তো। লোকজন এলে বলেন, 'তোমরা ব'সো। শিকারে গ্যাছে আমার ভাই আর ভাইপো। এখ্খনি এসে পড়বে।' উনি নাকি দেখতেও পান, তারা আসছে। আমাদের নানীও নাকি দেখেছে।"

"অ্যাঁ!" প্রদ্যোতের গলা থেকে একটা আঁতকে ওঠার শব্দ হল। ফ্যাকাশে মুখ আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একরাশ ভয় এসে জমা হল চোখের তারায়।

"ঐ যে জ্যাঠাইমা এসে গ্যাছেন। আপনি যেন এসব কথা তুলবেন না তাঁর কাছে।" বলে উঠে গেল রূপা। এগিয়ে গিয়ে প্রদ্যোতের আসার খবরটা বাইরে থেকেই জানিয়ে দিল জ্যাঠাইমাকে।

মিসেস রায় ঘরে ঢুকেই সস্নেহ কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালেন, "এই যে, কতক্ষণ এসেছ বাবা ?"

প্রদ্যোৎ কি রকম অদ্ভুত গলায় বললে, এই তো।

"আমি অন্য রাস্তায় গিয়েছিলাম বলে দেখতে পাইনি। এক রাস্তায় হলেও হয়তো মিস্ করতাম। যা ফগ্ বাইরে। দু-হাত দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, তুমি ব'সো। আমি এগুলো ছেড়ে আসছি। পদুকে চা দিসনি রূপা ? কেয়াকে দেখছি না। সে কোথায় গেল ?"

দুটো গেট বাড়ির। একটা উপরে উঠবার রাস্তায়, আরেকটা ডাউনে, অর্থাৎ ভাঁটার দিকে, রাস্তাটা যেখানে নীচে নেমে গেছে। মিসেস রায় ঢুকেছিলেন প্রথম দরজা দিয়ে। ভিতরে যেতে যেতে থেমে গিয়ে বললেন, এই যে ওরাও এসে গ্যাছে। আমার ভাই আর ভাইপো। এসে অবধি তোমাকে দেখবার জন্যে পাগল। আলাপ হলে তুমিও খুশী হবে। ভাইপোটা তোমারই বয়সী, ভারী আমুদে।

প্রদ্যোতের বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল। চোখ দুটো আপনা থেকেই চলে গেল নীচের দরজার দিকে। কাচের কপাটের ওপারে দুটি আবছায়া নরমূর্তি, হাতে বন্দুক। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে !

মিসেস রায় ড্রইংরুম পেরিয়ে ভিতরে পা দিতেই উঠে পড়ল প্রদ্যোৎ। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা খুলেই কুয়াসার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

একটু পরেই ফিরে এলেন মিসেস রায়। সঙ্গে তাঁর ভাই আর ভাইপো। শূন্য ঘর দেখে অবাক। "একি ! কোথায় গেল ছেলেটা ?"

ঘরের বাইরে একবার উঁকি মেরে ডাকলেন, রূপা !

রূপা এল ছুটতে ছুটতে—কী, জ্যাঠাইমা ?

"প্রদ্যোৎ কোথায় গেল, জানিস ? তোকে কিছু বলে গেছে ?"

"না তো। কোথায় আর যাবেন? ঘুরতে-টুরতে গেছেন হয়তো। এখনি এসে পড়বেন।"

"ঘুরতে যাবে কী? এইমাত্তর বলে গেলাম, বসো। সরোজ আর দীপুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ভারী আশ্চর্য তো।"

যুবকটির মন্তব্য শোনা গেল, মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে।

"একটু নয়, বেশ একটু।"···যোগ করল রূপা।

"সে কী!" মিসেস রায় মেয়ের দিকে ফিরলেন।

"হ্যাঁ, কদিন ধরে দেখছি তো। কেমন কেমন যেন।"

"তাহলে আর এগিয়ে দরকার নেই, দিদি," ধীরভাবে কিন্তু বেশ জোর দিয়ে বললেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, "একটা ছিট-গ্রস্ত ছেলেকে জামাই করা যায় না।"

মিসেস রায়কে বড় চিন্তান্বিত দেখাল। রমানাথবাবুর কানে যখন খবরটা গেল, তিনি বললেন, আমারও মনে হয়েছিল ছেলেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, দার্জিলিংএ এসে কী কী দেখলে বল? একগাদা কি সব বলে গেল, কাঞ্চনজঙ্ঘার নামটা একবারও করল না।

সেদিনটা এই আসে এই আসে করে আশায় আশায় কাটল। পরদিনও দুপুর পর্যন্ত দেখলেন মিসেস রায়। লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে হোটেলে চিঠি রেখে এসেছিলেন। এসে পড়তে পারে। লাঞ্চের সময় কখন পেরিয়ে গেল, এলো না। বিকালে খবর নিয়ে জানলেন, সে চলে গেছে।

শুনেই সঙ্গে সঙ্গে কেয়ার ঘরে ছুটে গেল রূপা। দরজায় ছিটকিনি তুলে খুব খানিকটা নেচে নিল। তারপর হাতে তুড়ি দিয়ে বলল, কেল্লা ফতে।

"মানে?" ভ্রূ তুলল কেয়া।

"মানে ল্যাণ্ড্‌স্লিপ। বুঝলে না তো? আচ্ছা, তাহলে শোনো। তার আগে কি দেবে বল।"

অভিভাবিকা

॥ এক ॥

দরজাটা ভেজানো ছিল, যেমন থাকে। রুগীর কেবিন, তার উপরে হার্টের রুগী, কোন সময়েই বন্ধ করা চলে না। ভিতর থেকে সে ব্যবস্থাও নেই। বাইরে থেকে আছে। মাঝে মাঝে তালা ঝুলতে দেখা যায়। ক'দিন আগে সকালের দিকে যখন বারান্দায় একটু পায়চারি করছিলেন রাজেনবাবু, দেখলেন আট নম্বর কেবিন তালাবন্ধ। এই ব্লকে সবচেয়ে ভালো ঘর। এককোণে বলে পাশের দিকে একটা বাড়তি জানালা আছে। একদিন ব্লক সিস্টারকে বলেও ছিলেন কথায় কথায়, ঐ কেবিনটি যদি পাওয়া যেত। তিনি ভরসা দিয়েছিলেন, খালি হলে চেষ্টা করবেন।

নিজের ঘরে ফিরে ভাবছিলেন, তাঁকে একবার মনে করিয়ে দেবেন কিনা, এমন সময় নিজেই এলেন ব্লক সিস্টার। মেমসাহেব, তবে দেশী। রং কালো, গাঢ় কৃষ্ণই বলা চলে। প্রচুর পাউডার প্রয়োগে তাকে কিঞ্চিৎ হালকা করবার চেষ্টা হয়েছে। তার সাফল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন না তোলাই ভালো। নামটা অবশ্য খাঁটি বিলিতি— মার্গারেট রোজ; কথা বলেন ডবল ভাষায়,—নীচের স্তরে, অর্থাৎ অধীনস্থ নার্স, ওয়ার্ড-বয়, সুইপার, জেনারেল ওয়ার্ডের রুগী, এদের সঙ্গে হিন্দীতে, এবং উঁচু মহলে অর্থাৎ কেবিন-পেসেণ্ট, তাদের ভিজিটর, ডাক্তার ইত্যাদির সঙ্গে ইংরেজীতে। দুটোই তাঁর নিজস্ব, তার মধ্যে ব্যাকরণের যোগ অতি সামান্য।

রাজেনবাবুর ঘরে ঢুকে বললেন, গুড মর্নিং মিস্টার ডাট্। আট নম্বরে যাবেন নাকি? খালি আছে।

—ওখানে যিনি ছিলেন, চলে গেছেন বুঝি?

—ইয়েস, হি এক্স্‌পায়ার্ড লাস্ট্ নাইট্।

রাজেন দত্তর হঠাৎ গা ছমছম করে উঠল, যদিও ভয়টা অর্থহীন। ঐ ইতিহাস তো সব কেবিনেরই আছে। বর্তমানে যেটি দখল করেছেন তার ঠিক পূর্বকালীন বাসিন্দাও হয়তো ডিস্‌চার্জ-এর জন্যে অপেক্ষা করেন নি, তার আগেই অন্যলোকে যাত্রা করেছেন। তবু এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। জানা আর অজানা; একটা প্রায় চাক্ষুষ আরেকটা চক্ষুর অগোচর।

এড়িয়ে যাওয়াই স্থির করলেন রাজেনবাবু। বললেন, থাক, আর ক'টা দিনই বা আছি। এর মধ্যে আর টানাটানির দরকার নেই।

ভেজানো দরজার গায় নরম আঙুলের মৃদু আঘাত। বুঝলেন এ নিশ্চয়ই সেই লম্বা রোগামত নার্সটি—মাস ছয়েক হল কেরালার কোন গ্রাম থেকে এসে চাকরি নিয়েছে কোলকাতার বড় হাসপাতালে—ছ'টার টেম্পারেচার নিতে এসেছে। এছাড়া আর কোনো নার্স অমনি সাড়া দিয়ে ঢোকার ধার ধারে না। দুম করে পাল্লা দুটো খুলে দেয়। একজন পুরুষ ভোরবেলা নির্জন ঘরে শুয়ে আছে, একটি যুবতী মেয়ে ঢুকবে সেখানে, বলে আসবে তো? সেসব নিয়ম এখানে নেই। এটা হাসপাতাল। যে ব্যক্তিটি শুয়ে আছে সে পুরুষ না মেয়ে, সে প্রশ্ন অবান্তর। সে পেসেণ্ট। একটা অসুস্থ দেহ, যার সম্পর্কে কয়েকটা রুটিন বাঁধা কাজের ভার আছে তাদের ওপর। তাদের কাছে এইটুকুই তার পরিচয়। তার বেশী আর কিছু নয়।

অন্যত্র আবার এই মেয়েরাই কোনো অপরিচিত পুরুষের শোবার ঘরে ঢুকতে সঙ্কোচ বোধ করবে। এখানে করে না। এরই নাম বোধ হয় স্থান-মাহাত্ম্য।

কেরালার এই মেয়েটি একটু অন্য রকম। দরজা ভেজানো থাকলে দু-তিনটি ঠকঠক আওয়াজ করে। সম্ভবতঃ নতুন ঢুকেছে বলে এখনো সামাজিক জীবনের সাধারণ রীতি নীতিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

রাজেনবাবু শুয়ে ছিলেন। না উঠেই বললেন, কাম ইন্।

হীল তোলা জুতোর মৃদু খুটখুট্ শব্দ করে ঘরে ঢুকল মেয়েটি। একটু হাসল। মুখে সারারাত-জাগার ক্লান্তি। তার উপরে হাসিটি তেমন ফুটল না। তবু ঐ চেষ্টাটুকু বেশ লাগল রাজেনবাবুর। একটু মায়াও হল। কত আর বয়স? সতের আঠার হবে। বাপ-মা-ভাই-বোন ছেড়ে কোন্ দূর দেশ থেকে এসেছে চাকরি করতে। সখ করে নিশ্চয়ই নয়। না করলে চলে না, তাই। জীবনের দাবি বড় কঠোর।

মেয়েটির হাতে একটা ছোট এনামেলের ট্রে। গোটা কয়েক থার্মোমিটার রয়েছে তার মধ্যে, একপাশে কিছু তুলো, একটা শিশিতে স্পিরিট। একটা থার্মোমিটার তুলে নিয়ে আলোতে ধরল, কয়েকটা ঝাঁকানি দিয়ে স্পিরিট-ডোবানো তুলোয় মুছে নিয়ে চালিয়ে দিল রাজেনবাবুর জিভের তলায়। ডান হাতে তাঁর নাড়িটা টিপে ধরে আধ মিনিট তাকিয়ে রইল বাঁ হাতে তুলে ধরা বেঁটে মোটা পেন্সিলের মত দেখতে একটি বিচিত্র বস্তুর দিকে, যাকে বলে পাল্‌স্ মিটার।

জিভের তলা থেকে থার্মোমিটারটা সরিয়ে নিয়ে যখন পারার দাগটা দেখছে, রাজেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কত?

নিরুত্তরে মুখ টিপে একটু হাসল।

'বলবে না?' কৃত্রিম রাগ দেখালেন রাজেনবাবু। গম্ভীর উত্তর এল—'নো।'

বেড্-এর পাশে একটা টেবিল। তার উপরে খাতা রেখে কি লিখল এবং ওঁর দিকে চেয়ে তেমনি হেসে গটগট করে বেরিয়ে চলে গেল।

রাজেন দত্তের গায়ের তাপ স্বাভাবিক। সেটা তিনি জানেন এবং মেয়েটিও সে খবর রাখে। জিজ্ঞাসা করাটা বাহুল্য। তবু করেন, এবং এমন ভাব দেখান যেন জানাটা তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। ও তা বুঝতে পারে বলেই বেশ জোর দিয়ে বলে 'নো'। হাসপাতালের এই কর্মহীন, সঙ্গীহীন নিরানন্দ যান্ত্রিক জীবনে

এই মধুর ছল এবং তাকে ঘিরে একটুখানি কৃত্রিম কলহ—তার একটা আলাদা স্বাদ আছে। মূল্যও কম নয়। মেয়েটি চলে যাবার পরেও সেটা আরো কিছুক্ষণ মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেন।

কোনো কোনো দিন ইচ্ছা করেই বাদানুবাদটা একটু বাড়তে দেন। জ্বর থাক আর না-ই থাক, এ উৎপাত সব রুগীকেই দিনের মধ্যে অনেক বার সইতে হয়।

যখন যার ডিউটি থাকে সে আসে ঐ ট্রে নিয়ে। একদিন ও যখন এল, রাজেনবাবু বলে বসলেন, কত উঠল, না বললে নিতে দেবো না টেম্পারেচার। ইউ মে গো।

—বেশ, আমি 'স্টাফকে' গিয়ে রিপোর্ট করবো।

(স্টাফ্ নার্সকে ওরা সংক্ষেপে বলে স্টাফ্)

—করো গে। আমিও তোমার নামে কমপ্লেন করবো হাউস্ ফিজিসিয়ানের কাছে।

—হোয়াট্ ফর ?

—তুমি আমার টেম্পারেচার ঠিক মত রেকর্ড করছ না।

—অল রাইট ; আই শ্যাল্ অলসো কমপ্লেন এগেইনস্ট ইউ টু ডক্‌টর সেন।

ডকটর সেন গোটা ওয়ার্ডের চার্জে। বড় ডাক্তার। তাঁরই চিকিৎসাধীনে রয়েছেন রাজেনবাবু। শুনে যেন ভয় পেয়েছেন, এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন, কেন, আমি আবার কী করলাম !

—ইউ ওয়্যার রাইটিং।

এবার সত্যিই হার মানতে হল। লেখা একেবারে বারণ করে দিয়েছেন ডকটর সেন। সেটা ও জানে বলেই একেবারে মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়ে বসেছে। উনি যখন চুপ করে গেলেন, তখন, 'আমার সঙ্গে লাগতে আসা !'—এই গোছের একটা ভঙ্গি করে সে বিজয়িনীর মত বেরিয়ে গেল।

অন্য নার্সরাও—বেশীর ভাগ বাঙালী মেয়ে, ঐ বয়সী কিংবা কিছু বড়—ওঁকে কেবলমাত্র পেসেন্ট হিসাবে দেখে না। জনপ্রিয় লেখক

রাজেন দত্ত। বয়স হয়েছে। বোধহয় একটু বেশী লিখছিলেন। প্রথমে প্রেসার বাড়ল। তারপর হৃদযন্ত্র বেঁকে বসল। আশ্রয় নিতে হল হার্ট ইউনিটের কেবিনে। পরিচয়টা প্রথম দিনই বেরিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার, নার্স, পাশে যে কলেজ রয়েছে তার ছাত্রছাত্রী, কিছু কিছু রুগী এবং তাদের ভিজিটর ভিড় করে দেখতে আসত। একজন জলজ্যান্ত লেখককে এমনি হাতের কাছে পাওয়ার সুযোগ তো বেশী মেলে না।

লেখক সম্বন্ধে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে পাঠক পাঠিকাদের! বিশেষ করে পাঠিকাদের। নানা বিচিত্র প্রশ্ন নিয়ে আসত ঐ নার্সের দল। তারা লেখাপড়া জানে, ওঁর বই পড়েছে। যারা পড়েনি, সেই বইয়ের উপরে তোলা ছবি দেখেছে সিনেমায়। সেই সব নিয়ে ওদের প্রচণ্ড কৌতূহল।

একে লেখক, তায় এক মাথা পাকা চুল। সহজেই দাদুর দলে চলে গেলেন রাজেন বাবু। দলে দলে 'নাতনীরা' আসে নানা আবদার নিয়ে।

"আচ্ছা দাদু, আপনার ঐ গল্পটা সত্যি? 'বন হরিণী'তে স্বপ্নাকে নিয়ে যা লিখেছেন? স্বপ্নার মত কোনো মেয়ের সঙ্গে সত্যিই কি আপনার দেখা হয়েছিল?"

'তোমাদের কী মনে হয়?'

'বাঃ, আমরা কেমন করে জানবো? তাই ত জিজ্ঞেস করছি আপনাকে।'

'সব গাঁজা।'

'ইস, তাই বুঝি? তার মানে আপনি বলবেন না। বেশ, না বললেন।'

মুখ ভার করে প্রস্থানের উদ্যোগ করে প্রশ্নকর্ত্রী। রাজেনবাবু আর কী করেন? তাঁর গল্পগুলো যে মিথ্যা নয়, তাই নিয়ে আবার একটা মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলতে হয়।

ওষুধ নিয়ে যে আসে, সেও দু'টো কথা বলে।

'এই আপনার বড়ি রইল দাদু। দুটো একসঙ্গে খাবেন।'

'ও সর্বনাশ! ওগুলো বুঝি বড়ি? ও তো রীতিমত বড়া। তা আবার দু'টো একসঙ্গে! অসম্ভব। আমার গলাটা কি ঢাকের খোল?'

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে ওঠে। তারপর মাথা দুলিয়ে বলে, বুঝেছি, তার মানে, আমার খানিকটা কাজ বাড়ানো। নিন, ধরুন। দাঁড়ান, জল গড়াই আগে।

কাছে দাঁড়িয়ে খাইয়ে তবে যায়।

দুপুরের দিকে দু-তিনজন একসঙ্গে আসে। আবদার ধরে, একটা গল্প বলুন না?

—'তোমাদের বুঝি কাজকর্ম কিছু নেই? দাঁড়াও মিস্ রোজকে বলে দিচ্ছি!'

—'আপনাকে আর কষ্ট করে বলতে হবে না। এমনিতেই সারাদিন তুলো ধুনে দিচ্ছে।'

'খুব বকুনি দেয় বুঝি?'

'একেবারে বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী!'

সকলে হেসে ওঠে। রাজেনবাবু বলেন, 'ভালোই তো। বৌ হবার আগেই শাশুড়ীর স্বাদ পেয়ে যাচ্ছ। এরপরে কাজে লাগবে।'

'ও বাবা, ঐ রকম শাশুড়ী হলে স্রেফ গলায় দড়ি দেবো।'

একজন, তার বয়স একটু বেশি, মুখ বেঁকিয়ে বলে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

তার জীবনে কোনো শাশুড়ী অথবা তাঁর পুত্রের সম্ভাবনা দেখা দেবে কিনা, সে বিষয়ে বোধহয় সে সন্দিহান। আরো কেউ কেউ আছে এদের মধ্যে, যারা ও সম্বন্ধে নিশ্চিত। তারা জানে তাদের জীবনে কোনো শ্বশ্রূনন্দনের আবির্ভাব কোনোদিন ঘটবে না। সীমন্ত সাদাই থেকে যাবে। এদের দিদি-স্তরের চাকরে তারা। যৌবন কোথাও বিগত, কোথায়ও বিদায়োন্মুখ। কুমারীত্ব ঘোচেনি। তারা যে ইচ্ছা করে নান্ বা সন্ন্যাসিনীর আদর্শ বরণ করেছে তা নয়; নীড় বাঁধতে চেয়েছিল, মনোমত সঙ্গীর দেখা পায়নি। সেই ব্যর্থতা

তাদের ভিতরে বাইরে একটা কাঠিন্য এনে দিয়েছে। তারা হয়তো জানে না। অকারণে রূঢ় হয়ে ওঠে রুগীর উপর, ওয়ার্ড বয়দের উপর এবং বিশেষ করে ঐ ছোট মেয়েগুলোর উপর। ওদের এখনো সময় আছে, সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। এই 'দিদির' দলটি তাঁর কাছে বড় একটা আসেনা, কিন্তু তাদের জন্যে কেমন একটা মমতা বোধ করেন রাজেনবাবু।

একদিন একটি নতুন মেয়ে এল অন্য কোন ইউনিট থেকে বদলি হয়ে। বেশ সুশ্রী, কিন্তু মুখখানা বড় ম্লান। বয়স যা, সে তুলনায় যেন একটু বেশী পরিণত।

রাজেনবাবু বিছানায় শুয়ে কাগজ পড়ছিলেন। দরজা খোলা। কেবিনে ঢুকে একটি ছোট্ট কাশির আওয়াজ তুলে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারপর বলল, সকালে কিছু খাবেন না স্যার। আটটার সময় আপনার ব্লাড নেওয়া হবে।

রাজেনবাবু আগের দিনই জেনেছেন, সকালে তাঁকে কিছু রক্ত ব্যয় করতে হবে অভুক্ত থেকে, ওঁদের ভাষায় ফাস্টিং ব্লাড। এর বোধহয় মনে করিয়ে দেবার কথা, তাই দিয়ে গেল।

রাজেনবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, 'জানি', তার আগেই সে চলে গেছে।

তারপর এ কাজে ও কাজে আসে, যখন তার ডিউটি পড়ে। কিন্তু ঠিক যতটুকু সময় তার কাজ সারতে প্রয়োজন, তার বেশী এক সেকেণ্ডও থাকে না। ওদের দলে সে একটু সিনিয়র, বেল্ট্-এর রং থেকে ধরতে পেরেছেন রাজেনবাবু। একেবারে যারা নতুন তারা 'রেড'। তারপর গ্রীন, তারপর বোধহয় 'ব্লু' এবং সকলের পরে 'মেরুণ'। এর ছিল 'ব্লু-বেল্ট'।

ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে গল্প শুনতে বা শোনাতে যারা আসত—সব রং'ই থাকত তার মধ্যে—তাদের একদিন বলেছিলেন রাজেনবাবু, তোমরা তো ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছু চাওনা। আর ঐ মেয়েটিকে দেখেছ? মুখে একটি কথা নেই, শুধু কাজ নিয়ে আছে!

—কে, বলুন তো ?

—ঐ যে বেশ লম্বা দেখতে, সকাল বেলা ছিল, মীনার সঙ্গে এসেছিল বিছানাটা ঠিকঠাক করতে। মীনা বকবক করছিল, যেমন করে, সে একটি কথা বলেনি। মুখে হাসিটি পর্যন্ত নেই!

—'ও-ও, দীপালির কথা বলছেন'।—অনুমানটা আরেক জনের। সকলেই তাকে নীরবে সমর্থন করল। অর্থাৎ মেয়েটি কে, ওরা ধরতে পেরেছে। সেটা তেমন আশ্চর্য নয়। রাজেনবাবুর বর্ণনা থেকে নিজেদের মধ্যে একজনকে বের করা এমন কি আর কঠিন ? আশ্চর্য লাগল তার সম্পর্কে এদের একেবারে চুপ করে যাওয়া। শুধু তাই নয়, এর পরে অন্য কথাও তেমন জমল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যে কেউ কাজের অজুহাত, কেউ আর কোনো ওজর দেখিয়ে চলে গেল।

লেখক মানুষ। সামান্য জিনিষও চোখে পড়ে, কৌতূহলের উদ্রেক করে। এর ভিতরে যে রহস্য আছে সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত,—তাকে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। রাজেনবাবু সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তাঁর ভরসা ছিল, যেহেতু এরা সকলেই স্ত্রীজাতি, তাঁকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। এদের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তাঁকে সাহায্য করবেন।

দিন কয়েক পরে চাদর এবং বালিসের ওয়াড় বদলাতে এসেছিল মীনা। গলাটা একটু মোটা, কথাও বলে জোর গলায়। যা কিছু করবে, হৈ চৈ ক'রে। চলার মধ্যে ঝড়ের গতি।

সেই ভাবেই ঢুকল। রাজেনবাবু শুয়ে ছিলেন। এসেই তাড়া দিল, চট করে একবার উঠে পড়ুনতো দাদু। যখনই আসি হাতে একটা বই। কী করে যে এত পড়েন ?

'এখানে আর করবার আছে কী' ?—উত্তর দিল ওর সঙ্গিনী। দুটি করে নার্স লাগে এই কাজে।

'তাই একবার বল দিকিন'—বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বললেন রাজেনবাবু, 'তোমাদের বয়স আর এনার্জি, এই দুটো জিনিস যদি

ফিরে পেতাম, তাহলে নাহয় এই লম্বা করিডোরের এধার থেকে ওধার আর ওধার থেকে এধার রেস দিয়ে বেড়াতাম।”

“খুব হয়েছে” মোটা গলায় হেসে উঠল মীনা” আপনাকে আর রেস্ দিতে হবেনা। যত খুশি বই পড়ুন শুয়ে শুয়ে।”

ওরা যখন বিছানা করছে, রাজেনবাবু অন্য মেয়েটিকে বললেন, তুমি বুঝি নতুন এসেছ এই ওয়ার্ডে ?

নরম গলায় উত্তর এল, হ্যাঁ।

“দীপালির বদলে এসেছে”—যোগ করল মীনা।

“দীপালি !”

“ঐ যে, যার খুব তারিফ করছিলেন আপনি। সে সার্জিক্যালে গ্যাছে।

“এরই মধ্যে ! এই তো সেদিন এল।”

“ইচ্ছে করে গ্যাছে। মেট্রন বদলি করতে চায়নি। অনেক বলে কয়ে রাজী করিয়েছে বুড়িকে।”

রাজেনবাবু মুখে কিছু জানতে চাইলেননা, কিন্তু জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। মীনা সে দিকে চেয়ে মেয়েটিকে বলল “তুই যা, আমি আসছি।” সে গেলে ফিরল রাজেনবাবুর দিকে—“কারণ আছে। সেই ভদ্দরলোক আবার এসেছে।”

“কোন্ ভদ্দরলোক ?”

“আছে একজন।”

দীপালি-ঘটিত রহস্যটা এবার কিঞ্চিৎ রং ধরল। সেই চিরন্তন ব্যাপার। একটি ‘ভদ্দর লোক’! সবে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, ধীরে ধীরে প্রকাশমান। রাজেনবাবু অপেক্ষা করে রইলেন। মীনা বলে চলল—

“আট নম্বর কেবিনে আছে। প্রথমবার এসে একটা ফ্রী বেড্-এ ছিল। মারাত্মক কিছু নয়, হার্টটা একটু ডাইলেটেড্। কত আর বয়েস ? তিরিশের বেশী নয়। চেহারাখানা দেখবার মত। রঙটা একটু ময়লা। কিন্তু যেমন লম্বা তেমনি নাখ মুখ। চোখ দুটো ভারী

সুন্দর। আর কী মিষ্টি কথা! আমরা বলাবলি করতাম, ঐ ফ্রী বেডের ভিড়ের মধ্যে ওকে মানায় না। ডাক্তাররা অবিশ্যি খুব যত্ন করে দেখতেন। আমরাও যতটা পারি করতাম। তারপর, কী হল জানেন?”

“কী হল?”

“দীপালীটা মজল। আর, ওরও নজর পড়ল তার দিকে।”

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, হায়রে!

—যান, আপনি ঠাট্টা করছেন! আমি বলবোনা।

—বল কী! এ রকম একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করছি! বাকী সকলের হয়ে একটু বেদনা প্রকাশ করেছিলাম।

—বেশ, তাহলে রইল ঐ পর্যন্ত।

—না, না, তুমি বল। আমি আর একটি শব্দ করবো না।

বলবার জন্যে মীনার নিজের উৎসাহও কম ছিল না। কিন্তু বলা হল না। সেই মেয়েটি এসে ডেকে নিয়ে গেল, “শীগগির এসো মীনাদি। গোলাপবালা জোর তলব পাঠিয়েছেন।

মার্গারেট রোজকে ওরা নিজেদের মধ্যে বলত গোলাপবালা, কখনো কখনো বাসরাই গোলাপ।

॥ দুই ॥

হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাবার মাস তিনেক পরে অন্য সব চিঠিপত্রের সঙ্গে একটা মোটা খামের চিঠি পেলেন রাজেন দত্ত। মেয়েলি ধাঁচের অচেনা হাতের ঠিকানা। নিশ্চয়ই কোনো ভক্ত পাঠিকা। কড়া সমালোচিকাও হতে পারে। খুলে দুচার লাইন পড়েই বুঝলেন, না, এ অন্য জিনিস। নামটা দেখে নিলেন—দীপালী।

‘নামটা আপনার মনে আছে কি? না থাকবারই কথা’। বলে, মনে করিয়ে দেবার জন্যে যতটুকু তথ্য দরকার গোড়াতেই তার উল্লেখ করেছে। তারপর আসল বক্তব্যের অবতারণা।

'আমি আপনার অনেক বই পড়েছি। ভীষণ ভালো লাগে আপনার লেখা। সেই আপনাকে যখন অত কাছে পেলাম, কী ইচ্ছে যে হত, দু মিনিট একটু বসি আপনার কাছে, দুটো কথা শুনি! আমার আর সব বোনেরা যেত, গল্প করত। আমি পারতাম না। কেবলই মনে হত, আমার বুকের মধ্যে যে গোপন লজ্জা লুকোনো আছে, যার জন্যে আমি কারো মুখের পানে তাকাতে পারি না, কারো সঙ্গে হেসে কথা বলতে পারি না, সেসব আপনার কাছে ধরা পড়ে যাবে। সাহিত্যিকরা তো সকলের মনের কথা টের পান।

আবার একথাও ভেবেছি, সব আপনাকে খুলে বলি। আপনার কাছে আর লজ্জা কী? বরং বলবার পর বুকটা হালকা হয়ে যাবে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো, সহজ ভাবে মিশতে পারবো সকলের সঙ্গে। হয়তো বলতাম। কিন্তু তার আগেই আমাকে আবার ঐ ইউনিট ছাড়তে হল। কেন, তা আপনি জানেন। মীনা আপনাকে বলেছে।'

এরপর মীনা যার আভাস দিয়েছে, তারই বিশদ বর্ণনা। দিনের পর দিন কেমন করে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সে ওকে প্রবল টানে টেনে নিচ্ছিল, বিশেষ করে তার সেই মোহন দুটি চোখ, সেই ইতিহাস অকপটে ব্যক্ত করেছে দীপালী।

'সকলের চেষ্টা-যত্নে, সেবায় (তার মধ্যে আমার দুটি হাতও ছিল) সে ভালো হয়ে চলে গেল। এ অসুখে পুরোপুরি কিংবা বরাবরের জন্যে ভালো কেউ হয় না। তবু ডক্টর সেন তাঁকে ছেড়ে দিলেন, বললেন, 'রেস্ট'এ থাকবেন। 'রেস্ট' কোথায় পাবে সে? অসুখের জন্য চাকরি গেছে। নিজে মেসে থাকে, দেশের বাড়িতে বিধবা মা ছোট ছোট ভাই বোন। তাদেরও অনেকখানি ভার বইতে হয়। আরেকটা চাকরি চাই! তারই ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ঘুরলেই কি চাকরি হয়?

যে দিনগুলোতে আমার বিকেলে ডিউটি থাকে না, আমাদের দেখা হয় ইডেন গার্ডেনে। প্রায়ই গিয়ে দেখি, সে অপেক্ষা করছে।

বড় ক্লান্ত, কণ্ঠার হাড় আরো খানিকটা বেরিয়ে এসেছে, চোখের কোণে কালি। আমি বলি, করছ কী! আবার পড়বে যে। তখন দেখবে কে ?

সে হেসে বলে, কেন, তুমি? সে বেড়টা না হোক, তার কাছাকাছি আর একটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

এমন করে তাকায়, আমার বুকের ভেতরটা ওলট পালট হয়ে যায়। আমি জোর দিয়ে বলি, না, অত ঘোরাঘুরি করতে হবে না। দু দিন জিরিয়ে নাও।

আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফল নিয়ে যাই। প্রথম দু-একদিন কিছুতেই নিতে চায়নি—"তুমি আমার জন্যে টাকা খরচ করবে কেন ? দশ পঞ্চাশ তো আর পাওনা।"

'তা হোক,'—আমি জোর করে গছিয়ে দিতাম। তারপর আর আপত্তি করেনি।

নটার মধ্যে আমাকে কোয়ার্টার্সে ফিরতে হয়। প্রায়ই ট্যাকসিতে ফিরি। ভাড়াটা আমাকেই দিতে হয়। ও কোথায় পাবে? আপনি আমার গুরুজন, তবু লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, ফাঁকা রাস্তায় পড়ে সে যখন দু হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলতে চায়, আমার কোনো জ্ঞান থাকে না। তখন মনে হয় ঐ কটা টাকা তো তুচ্ছ, তার জন্যে আমি আমার সব দিতে পারি।

একদিন বলল, নতুন মেস খুঁজছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

—ম্যানেজারটা রোজ অপমান করছে। প্রায় দু মাসের টাকা বাকী।

—কত টাকা ?

—সে অনেক।

তার দু দিন আগে আমি মাইনে পেয়েছি, তখনো বাড়িতে পাঠানো হয়নি। সেখানেও দরকার খুব। তবু পরদিন কুড়িটা টাকা এনে দিলাম ওর হাতে। বললাম, 'আপাততঃ এই দিয়ে ঠেকিয়ে রাখো লোকটাকে।' কিছুতেই নেবেনা। অনেক করে

গছিয়ে দিলাম। বললাম, ধার নিতে আপত্তি করছ কেন? যেদিন পারবে, শোধ করে দিও। সে বলল, সে দিন কি আর এ জীবনে আসবে? তার আগেই বোধহয়···

আমি হাত দিয়ে ওর মুখটা চেপে ধরলাম—'ছিঃ, ও কথা আমি শুনতে পারবোনা।'

শরীর আবার দিন দিন খারাপ হচ্ছিল। ওদিকে চাকরির কোনো হদিস নেই। কোনো কোনো জায়গায় এক আধটু সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই আশায় দৌড়তে হয়।

সেদিন অনেক দেরি করে এল। ইডেন গার্ডেনের গেটে আমি তার আগেই গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটা ঝোপের পাশে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। গরমের দিন। বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। একটা অচেনা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল তার সঙ্গে। আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ওর জন্যে। কিছুই ভালো লাগছিল না। ও আমার দিকে মাঝে মাঝে দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে আমার ডান হাতটা নিজের দুটি হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, কী ভাবছ?

এমন মধুর করুণ স্বর আমি কখনো শুনিনি। বললাম, কী আবার ভাববো?

—না, বলতে হবে। না বললে আমি রাগ করবো।

—কী ভাবছি তা কি বোঝনা? তোমার এই শরীর, তার ওপরে এত ঘোরাঘুরি। অথচ, আমি কিছুই করতে পারছিনা।

—'নেবে আমার ভার?' আমার হাতের উপর একটা চাপ দিল। আমি চমকে উঠলাম, তারপরেই আমার সমস্ত অন্তর কানায় কানায় ভরে উঠল। চোখ দুটো জলে ভরে গেল। তার মধ্যেই তার কথা শুনতে পেলাম, 'অবিশ্যি, সে ভার বড় সহজ ভার নয়। একটা বেকার মানুষ তার ওপরে অসুস্থ, হার্টের রুগী।···শুধু খাওয়ানো পরানো নয়, সেই সঙ্গে আবার—

আমি ধমকে উঠলাম, হয়েছে; এবার থামোতো।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি কেউ নেই। নিজেকে

এলিয়ে দিলাম তার গায়ে। আর কোন কথা আমার মুখে এলনা। শুধু বললাম, তোমাকে আমি দু'দিনে ভালো করে তুলবো।

সে আমার মাথাটা চেপে ধরল তার কাঁধের উপর।

সে রাত্রে আমরা ট্যাকসি করে সারা ময়দানটা ঘুরে বেড়ালাম। হাসপাতালের কাছে এসে যখন নামলাম, আমার সারা অঙ্গে জড়িয়ে আছে তার গাঢ় স্পর্শ, সারা মনে ছড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য মধুরিমা, যার স্বাদ এমন করে আর কখনো পাইনি।

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। নটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। একবারও খেয়াল হয়নি। সময়ের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

রাত নটায় নার্স-কোয়ার্টার্সের গেট বন্ধ হয়ে যায়। একজন সিনিয়র 'স্টাফ' এর ডিউটি পড়ে সেখানে। তাকে বলে নাইট-সিস্টার। তার কাজ হল, যে নার্স দেরি করে ফেরে তার নাম টুকে রাখা এবং মেট্রনের কাছে রিপোর্ট করা। পর দিন সকালে তার কৈফিয়ত তলব করেন মেট্রন। এ সবই সে জানত।

গেট থেকে খানিকটা দূরে যখন বিদায় নেবার জন্যে দাঁড়িয়েছি, সে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

—না, না ; তুমি কি করতে যাবে ?

বলে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেলাম।

প্রতিমাদির ডিউটি ছিল। ভারী কড়া, আর তেমনি খিট্‌খিটে। আমাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলে এত রাত ?

কিছু একটা বলতে গেলেই মেজাজ আরো চড়ে যায় প্রতিমাদির। তাই চুপ করে রইলাম। আরেকটা মোক্ষম ধমক দিতে গিয়ে গর্জে উঠেই হঠাৎ থেমে গেলেন। বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, কে আপনি ?

ও যে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, জানতাম না। বলল, আমাকে চিনতে পারছেন না ? কমাস আগে অনেক দিন কাটিয়ে

গেলাম আপনাদের হার্ট ইউনিটে। আপনি তো ওখানে 'স্টাফ' ছিলেন তখন।

"—ও-ও, আপনি!" একগাল হাসি প্রতিমাদির মুখে। চিনলেন বলেই মনে হল।

এবার আমাকে দেখিয়ে বলল, এই সিস্টারকেও তখন দেখেছি। আজ আবার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। যেখানে গিয়েছিলেন, শ্যামবাজারে ওঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি, সেখানে আমার মাসীমা থাকেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আটটার সময় বেরিয়ে দেখি ওপাড়ায় ট্রাম বাস বন্ধ, পুলিশের সঙ্গে পাবলিকের মারামারি হয়ে গেছে একটু আগে। উনি বললেন, আমাকে ন'টার মধ্যে ফিরতেই হবে। ট্যাক্সি দু'একখানা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। ওঁর পক্ষে একলা ওঠা ঠিক নয়। ও বাড়িতেও সঙ্গে আসবার মত কেউ ছিলনা। মেসোমশাই আমাকেই বললেন, মেয়েটিকে পৌঁছে দিস। আমাকেও উনি চিনলেন দেখলাম। কাজেই আসতে হল। এর আগে কোনো মতেই আসবার উপায় ছিলনা। তাহলে আসি? নমস্কার।

গল্পটা প্রতিমাদি বিশ্বাস করলেন কি না তিনিই জানেন। তবে ও নিয়ে আমাকে আর টানা হেঁচড়া করলেন না। দেরিতে আসাটা অবিশ্যি নোট না করে ছাড়লেন না। তার ফলে ব্যাপারটা ছড়িয়ে গেল। আমার বন্ধুরা আমাকে এমন খোঁচাতে আরম্ভ করল যে শেষ পর্যন্ত একজনের কাছে বলে ফেললাম। সবই তো ঠিক হয়ে গেছে, আমাদের দেখাশুনাও আগের মত চলছে, বলতে আর দোষ কী? আমার বয়সী নার্সদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বড়রাও কেউ কেউ আমাকে ডেকে নিয়ে কংগ্রাচুলেট্ করলেন।

আমার খানিকটা সর্টহ্যাণ্ড পড়া ছিল, টাইপরাইটিং আগেই শিখেছিলাম। রাত জেগে জেগে পিটম্যান প্রাকটিস্ করতে লাগলাম। এ চাকরী যখন ছাড়তে হবে তখন এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়া দরকার এবং তাতে যেন অসুবিধা না হয়। সেও শুনে খুশী হল।

লেবার-ইউনিটে হাউস্ সার্জন ছিলেন ডাক্তার মিস্ শুভা বিশ্বাস। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, দেখতে মোটেই ভালো নন, সাজগোজের উপর ভীষণ ঝোঁক। তাই নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। দু-একটা ফাজিল মেয়ে বলত, আহা রে! বেচারার জন্যে দুঃখু হয়। এত রং বেরং-এর শাড়ী, নতুন নতুন জামার কাট্, স্নো, পাউডার, লিপষ্টিক, সব জলে গেল। কেউ একবার ফিরেও দেখল না!

শুভাদির মামাবাড়ী আমাদের দেশে। উনি যখন এম. বি. বি. এস. পাস করে হাসপাতালে চাকরি পেলেন আমার কাকা ওঁর মামাকে দিয়ে ওঁকে ধরে আমাকে নার্সের-ট্রেনিংএ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। উনি চেষ্টা না করলে আমি চাকরী পেতাম না। ওঁর কাছে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। এখানেও উনিই ছিলেন আমার গার্জেন।

একদিন শুভাদি আমাকে ওঁর কোয়ার্টার্সে ডেকে পাঠালেন। বললেন, এসব কী শুনছি?

ওঁকে যতটা বলা যায় বললাম। আমরা যে দু'জনে দু'জনকে কথা দিয়েছি, তাও জানালাম। উনি বিশেষ খুশী হলেন না। বললেন, তোমার কাকাকে, মাকে জানিয়েছ?

—শীগগিরই জানাবো।

—তার আগে আমার তো একবার দেখা দরকার, ছেলেটি কে, কী রকম।

—কালই আসতে বলবো আপনার কাছে।

সে দেখা করে এল। প্রথমটা একবার, ক'দিন পরে আরেকবার, তারপর বার বার। ওদিকের যাতায়াত যত বাড়ল, এদিকের অর্থাৎ ইডেন গার্ডেনের যাওয়া আসাটা ততই কমে আসতে লাগল। তারপর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল, শুভাদির সিঁথিতে সিঁদুর!

তারপর এল একখানা চিঠি। সেটা আমি পড়েই ছিঁড়ে ফেলে

দিয়েছিলাম। কিন্তু তার সেই কথাগুলো এখনো এই বুকের মধ্যে কেটে কেটে বসে আছে। উপড়ে ফেলতে পারছি কই? সব আপনাকে বলা যায় না। কয়েকটা মাত্র লাইন এখানে তুলে দিলাম ঃ—

'সংসারে প্রথম এবং আসল চিন্তা হল বেঁচে থাকা। প্রেম-ট্রেম বা ঐ জাতীয় যা কিছু, সব তার পরে। বাঁচবার চেষ্টা আমি কম করিনি, তুমি তা জান। কিন্তু নিজের শক্তিতে যখন কুললো না, তখন আমার একমাত্র সম্বল এই চেহারাটা বেচে দেওয়া ছাড়া আর কী উপায় আছে বল। তুমি যে দাম দিচ্ছিলে সে আর কত? তার চেয়ে বেশী দর পেয়ে গেলাম। কাজেই,—বুঝতে পারছ?

এতে তোমারও ভালো হল। এ বোঝা বইতে গিয়ে তুমি দু'দিনেই হাঁপিয়ে পড়তে। ভাবতে, 'এ কী করলাম!' তখন না পারতে টানতে, না পারতে ফেলতে। সেই দোটানা থেকে দুজনেই বেঁচে গেলাম।

আমিও নিজেকে বোঝাতে চাইছি—এ ভালোই হল। কিন্তু এই 'ভালো'ই কি চেয়েছিলাম, না, সকলে চায়?

আপনি তো অতবড় সাহিত্যিক, আপনিই বলুন।

লাভের গুড়

কাল থেকে পূজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। মোটমাট পাঁচ দিন। একে সওদাগরী অফিস, তায় খাস ব্রিটিশ। এইটুকু দাক্ষিণ্য যে দেখিয়েছে, সেই ঢের। একেবারে না দিলেই বা কী করতে পারতাম ?

কথাটা শুনে আজকের পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। তাই বলে রাখি, ঘটনাটা ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেকার। এখন হলে বলতাম —কী না করতে পারতাম !

শেয়ালদা থেকে বনগাঁর প্রথম গাড়ি ছাড়ে বলতে গেলে শেষ রাতে। ওটাতে বোধ হয় হ'য়ে উঠবে না। তার পরেরটা অবশ্যই ধরতে হবে। পাঁচদিনের পাঁচটা মিনিটই বা মেস্‌এ বসে নষ্ট করি কেন ? সুতরাং বড়মামার সঙ্গে দেখা করার পালাটা আজই সেরে রাখতে হয়। ডালহৌসী থেকে উত্তরের ট্রাম না ধরে দক্ষিণ-মুখী হলাম।

ভবানীপুরের বাসায় ঢুকতেই মামাতো ভাই নন্তুর সঙ্গে দেখা। গম্ভীরভাবে বলল—এই যে ছোড়দা এসে গ্যাছ ? আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

'কী ব্যাপার ?'

'বসো, আসছি।'

একটু ভাবনা হল। কোনো গোলমেলে খবর হবে নিশ্চয়ই। নন্তু এল মিনিট কয়েকের মধ্যেই। হাতে কাপড় ঢাকা দেওয়া কী একটা জিনিস। আমার পাশে রেখে ঢাকাটা তুলেই হেসে উঠল। সত্যিই তাক লাগিয়ে দিয়েছে নন্তু। বলল—অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি তোমার জন্যে।

আমি পরম স্নেহে জিনিসটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—'অ্যালসেশিয়ান বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে মানে? একেবারে হাণ্ড্রেড্ পারসেন্ট্ পিওর। ক্রস্ ব্রীড্ ফ্রীড্ নয়। ক্রীপ্ সাহেবের মালীকে নগদ দশটি টাকা ঘুষ দিয়ে তবে বের করতে পেরেছি। সাহেব জানে না। তাকে বলেছে—বাচ্চাটা মরে গ্যাছে, সায়েব।'

একটি অ্যালসেশিয়ানের স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। আমার চেয়েও বেশী, ছোট বোন তরুর। যখনই বাড়ি যাই তার প্রথম কথা হল, আমার কুকুর? অন্য কোনো জাত হলে চলবে না। অ্যালসেশিয়ান। অনেক চেষ্টা করেছি। হাতিবাগানের বাজারে পেয়েছিলাম দু একটা। দাম যা হাঁকল, শুনে চক্ষু স্থির। মাত্র দশটি টাকায় এ জিনিস! কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছিল আজ!

পূজোয় বাড়ি যাওয়া মানে অনেক ঝামেলা। কাপড় জামার সঙ্গে টুকটাক অনেক জিনিস জড়ো হ'ল। পাশের বাড়ির ঘোষাল-দাদুর ফরমাস ছিল এক ঝুড়ি কড়া পাক। মফঃস্বলের নরম নরম সন্দেশ তাঁর পছন্দ নয়। ভীমনাগ থেকে নিতে বলেছিলেন। সেই সঙ্গে বাড়ির জন্যেও কিছু নিতে হ'ল। মিষ্টিই হ'ল গোটা পনেরো টাকার। তার মানে এখনকার প্রায় পঞ্চাশ টাকা।

ষ্টেশনে যখন পৌঁছলাম, গাড়ি ছাড়তে মিনিট দশেক বাকি। কুকুর তো বুক্ না করে নেওয়া চলে না, হলই বা বাচ্চা। ভীষণ কড়াকড়ি তখন রেলের। রাস্তায় ক্রুর উৎপাত আছে। ধরতে পারলে ভাড়া তো নেবেই, তার উপরে মোটা টাকা পেনালটি আদায় করে ছাড়বে। এখনকার আমল তো নয়, যে সহযাত্রীদের সাহায্য পাবো। ভাড়া চাইলে ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে ক্রু বাবাজীকে! এত সুখ ছিল না তখন। পরাধীন দেশ তো। আইন মেনে চলতে হত।

পূজোর ভিড়। অত কম সময়ে কুকুর বুক করা অসম্ভব। যা থাকে কপালে বলে উঠে পড়লাম। বসবার জায়গা নেই। হাতের বাচ্চাটির দিকে নজর পড়তে, এক ভদ্রলোক তাঁর পাশে একটু জায়গা ক'রে দিলেন। অর্থাৎ কুকুরের কল্যাণে বসতে পেলাম।

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক আমারই মতো কুকুর-পাগল, এবং তার উপরে এদের জাতধর্ম-বিষয়ে জানেনও অনেক কিছু। অর্থাৎ যাকে বলে সারমেয়-তত্ত্বে সুপণ্ডিত। এক ফাঁকে দামটা জানতে চাইলেন। আমি তো আর বলতে পারি না, এটি চোরাই মাল কিংবা ঘুষের সংগ্রহ। বললাম—'পঁচিশ টাকা নিয়েছে।' 'খুব সস্তায় পেয়েছেন, যাকে বলে দাঁও মারা। আসল অ্যালসেশিয়ান। খাইয়ে দাইয়ে ঠিক মতো মানুষ করতে পারলে এই কুকুর আপনার বাঘের কাজ দেবে।'

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল! একটা কোনো স্টেশনে গাড়ি আসতেই কামরার ওধারে ক্রুর দর্শন পাওয়া গেল। ভদ্রলোক আমার চোখ মুখের অবস্থা দেখেই বোধহয় ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। বললেন—'দিন ওকে আমার কাছে।' বাচ্চাকে জামার তলায় লুকিয়ে ঢুকে পড়লেন বাথ্‌রুমে। পরের স্টেশনে গাড়ি থামবার পর আরো খানিকটা সময় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ক্রু তখন চলে গেছে। আমি বললাম—'খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনি।' স্বভাবতই আমার সুরে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। তিনি বললেন—ও কিছু না। এখনো কিন্তু আমাদের বিপদ কাটে নি। ক্রুর ওপরে আবার সর্দার-ক্রু আছে, ক্রু-ইন্‌-চার্জ। সে ব্যাটা যেখানে সেখানে উঠে সারপ্রাইজ চেক্‌ করে। এক কাজ করা যাক। আমার পকেটে চকোলেট ছিল। খাইয়েছি। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শীগগির আর সাড়া শব্দ দেবে না। ওপরে তুলে দিই।

ভদ্রলোকের জিনিস পত্র ছিল বাঙ্কের একেবারে কোণের দিকে, তারপরেই আমার মাল। ওরই কোন একটা ফাঁকে বাচ্চাকে ঢুকিয়ে দিলেন। চমৎকার গল্প জমাতে পারেন ভদ্রলোক। দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল। গোবরডাঙ্গা ছাড়িয়ে একটা কি ছোট স্টেশনে আসতেই তিনি উঠে পড়ে বললেন—আমি এবার নামবো। আপনার বাচ্চা দেখে নিন।

হেসে বললাম—গোড়াতে আমার ছিল, এখন ওটা আপনার বাচ্চা। ওর জন্যে যা কাণ্ড করতে হয়েছে আপনাকে—

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। আশেপাশে যারা ছিল, তাদের মুখেও হাসি-হাসি ভাব ফুটে উঠল। অর্থাৎ কথাটা সকলেই উপভোগ করল। উনি কুলী ডেকে মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন।

বারাসতে পৌঁছে খুচরো জিনিসগুলো নিচে নামাতে গিয়ে দেখি বাচ্চাটা তো নেই। কোথায় গেল? কোনো বাক্স বিছানার আড়ালে ঢুকে গেছে হয়তো। সারা বাঙ্ক খালি হয়ে গেল! নেই তো নেই। আশেপাশের চোখগুলোয় এবারেও হাসি-হাসিভাব লক্ষ করলাম। অর্থাৎ এটাও সকলে উপভোগ করছে।

মিষ্টির ঝুড়িটা নামাতেই টের পেলাম, অত সাধের অ্যালসেশিয়ান মাঝপথে চলে গেলেও প্রভুকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে নি। কিঞ্চিৎ স্মৃতি রেখে গেছে। 'ভীমনাগ'এর মধুরগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঝুড়ির উপর কখন চড়ে বসেছিল। স্বাদ নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, কড়াপাকের সন্দেশগুলোকে সরস ক'রে দিয়ে গেছে।

ভ্যানিটি ব্যাগ

কিসের একটা ছুটি ছিল সেদিন। চন্দননগরে কোন এক সাহিত্য সভায় বক্তৃতাদি সেরে ষ্টেশনে পৌঁছেই ফিরবার গাড়ি পেয়ে গেলাম। তেমন কিছু ভিড় নেই। গোড়া থেকেই বসে আসা গেল—বেশ হাত পা ছড়িয়ে, চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে নয়। শুনলাম, রাতের মত এইটিই নাকি এ গাড়ির শেষ যাত্রা। রিটার্ণ ট্রিপ নেই। কী যে আনন্দ হল। হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে অক্ষত দেহে নামা যাবে। উল্টোমুখী যাত্রীযূথের আক্রমণে হাত, পা, নাক, একপাটি জুতো কিংবা আদ্ধেকটা পাঞ্জাবী রেখে যেতে হবে না।

আমার কোন তাড়া নেই। যাদের আছে তাদের এগিয়ে যেতে দিয়ে ধীরে সুস্থে নামছি। দরজার কাছ বরাবর আসতেই হঠাৎ নজরে পড়ল ওদিকের লাইনের শেষ সীটের পাশে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। দুটি তরুণী বসেছিল ওখানে। সমস্ত পথ হাসিগল্পে মশগুল হয়ে ছিল। দূরে বসলেও তাদের কলস্বর মাঝে মাঝে কানে এসে পৌঁছেছে। বিষয়টা বুঝতে পারিনি। হয়তো কোন বিষয়ই ছিলনা। তার কোন দরকার নেই এদের। শুধু কথার জন্যে কথা, গল্পের খাতিরে গল্প। এই বার বছর মেয়ে-কলেজে পড়াচ্ছি। এদের মানে এই জাতটিকে ভালো করেই জানি। কোথায় যেন পড়েছিলাম, বাক্য সম্পর্কে নারী-পুরুষের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বিধাতা পুরুষ। নারীর কাজ বর্ষণ পুরুষের গলাধঃকরণ। নিজেদের মধ্যে, অর্থাৎ পুরুষ সেখানে অনুপস্থিত, সেখানে এরা যুগপৎ বর্ষণ করেন। অর্থাৎ দুটি মেয়ে যখন কথা বলে, দুজনেই বক্তা, শ্রোতা কেউ নেই।

একেবারে ধারে যে মেয়েটি বসেছিল, দেখতে বেশ সুশ্রী। হয়তো তারই ব্যাগ। গল্পের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল। ভুলে ফেলে গেছে। এখনি আসবে ছুটতে ছুটতে।

একটুখানি দাঁড়িয়ে গেলাম দরজার সামনে। কই, কাউকে তো দেখছিনা। মরুক গে, আমার কী?

কয়েক পা গিয়ে পা দুটো আপনা থেকেই মন্থর হয়ে এল। এটা ঠিক হচ্ছে কি? হয়তো এখনো খেয়াল হয়নি মেয়েটির, তাই আসতে দেরি হচ্ছে। কিংবা তাড়া হুড়ো করে বাস্ এ উঠে পড়েছিল। তারপর পয়সা দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে, ব্যাগ নেই। এতটা আবার উজিয়ে আসতে হবে তো। সময় লাগবে।

মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে রইলাম। এখনি হয়তো ঝাড়ুদার উঠবে গাড়ি সাফ করতে। অমন একটা সুন্দর ব্যাগ হাতে পেয়ে নিশ্চয়ই ফেলে যাবে না। ওর মধ্যে আর যেসব জিনিস থাকে তার লোভে না হোক, টাকা পয়সার আশায় অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ে ফেলবে। ব্যাগটারও একটা দাম আছে। পুরনো মালের দোকানে বেচে দিতে পারবে।

মনস্থির করে ফেললাম। জিনিসটা নিয়ে যাওয়াই আমার কর্তব্য। চোরের হাতে পড়বে নিশ্চিত জেনেও ফেলে চলে যাওয়া দায়িত্বহীনতার পরিচয়। ওর মধ্যে হয়তো মালিকের ঠিকানাও পাওয়া যেতে পারে। না পাই, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেওয়া। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

ফিরে গিয়ে খালি গাড়ি থেকে ব্যাগটা তুলে নিলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে নিলাম। কেউ যদি দেখে, বিশেষ করে রেলের লোক, চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে, কে আপনি? কার ব্যাগ নিচ্ছেন? সেও এক ফ্যাসাদ। আপাততঃ তেমন কিছু ঘটলনা। রেলের লোক কেউ কোথাও নেই।

বেশ ভারী মনে হচ্ছিল ব্যাগটাকে। এই রকম একটা ভারী জিনিস বয়ে বেড়ায় নাকি মেয়েরা? কী আছে এর পেটে? কী থাকে? মোটামুটি একটা ধারণা অবশ্য আছে, কিন্তু চাক্ষুষ জ্ঞান নেই। বোধহয় কোন পুরুষেরই নেই। মেয়েদের এ এক রহস্যময় গোপন জগৎ। স্বামীর কাছেও অনধিগম্য! জানতে চাইলে

তৎক্ষণাৎ উত্তর পাওয়া যাবে, "এদিকে নজর কেন ? আছে অনেক কিছু। ওটা আমাদের ব্যাপার।" অর্থাৎ ওখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। আমার মনে হয়, এই মনোভাব লক্ষ করেই কোন রসিক পুরুষ এর নাম দিয়েছিল ভ্যানিটি ব্যাগ। এ ছাড়া আর কী ভ্যানিটি থাকতে পারে এর মধ্যে ?

নিজের কাছে লুকিয়ে লাভ নেই এই তুচ্ছ বস্তুটির উপর আমার মনে একটি গোপন কৌতূহল আছে। কে জানে নারীর অন্তরের রহস্যোদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা আর তার ব্যাগের অন্তরের রহস্য নির্ণয়ের ইচ্ছা, দুটো হয়তো একই জাতীয়। সে যাই হোক, আমার অনেকদিন ইচ্ছা হয়েছে স্ত্রীর অসাক্ষাতে একদিন খুলে দেখবো কী আছে তার ব্যাগে। কোনদিন দেখিনি। হয়তো আমার মধ্যে যে একটি প্রবীণ অধ্যাপক বসে আছে, সে-ই এই ছেলেমানুষিটা ঘটতে দেয়নি।

আজ এই নির্জন রেলের কামরা থেকে এইমাত্র যে একটি অচেনা মেয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে এলাম এবং তার ভিতরটা দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছি, তার মধ্যে আমার মনের সেই ছেলেমানুষি কৌতূহলটুকু লুকিয়ে নেই, একথা হলফ করে বলতে পারবোনা।

লেডিজ্ ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে চলেছে একজন পুরুষ মানুষ! হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের মধ্যেও এদিক ওদিক থেকে চোখ তুলে দৃশ্যটা অনেকে উপভোগ করছিল। বলা বাহুল্য, আমার পক্ষে সেটা মোটেই উপভোগ্য ছিলনা। এটাকে নিয়ে বাস-এ ওঠা মানে আরো কিছু লোকের কৌতুকের খোরাক যোগানো এবং হয়তো নানাজাতীয় প্রশ্নবাণের মুখে গিয়ে পড়া। সেটা এড়াবার জন্যে ট্যাক্‌সি ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"একি, মহিমদা কোত্থেকে ? হাতে ওটা কী ?"—ট্যাক্‌সি থেকে নামল আমার সহকর্মী অর্থাৎ ছেলেদের সেকশনের লেকচারার অঞ্জন বসাক।

"চন্দননগর গিয়েছিলাম। তুমি ?"

"দিল্লী চললাম।"

"সেই ইনটারভিউ ?"

"হ্যাঁ ; পরশু এগারটায়।"

"উইশ ইউ গুড্ লাক্।"

"আপনাদের আশীর্বাদই তো ভরসা।"

আমার গাড়ী এসে গিয়েছিল। উঠতে যাবো, অঞ্জন বাধা দিল। ব্যাগের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এটা কী ব্যাপার বললেন না তো ? আজকাল কি লেডিজ্ ব্যাগ নিয়ে বেরোচ্ছেন নাকি ? না, বৌদির জন্যে কিনে নিয়ে এলেন ?"

"না, হে, লেডিজ্ ব্যাগ লেডিরাই কেনে। ওর আমরা কি বুঝি ?"

"তবে ?"

"রেলের কামরায় কুড়িয়ে পেলাম।"

"অ্যাঁ ! তা, নিয়ে চললেন কোথায় ?"

"ভাবছি, আপাততঃ বাড়ীতে নিয়ে রাখবো। তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে—"

"কী দরকার ছিল অতসব হ্যাঙ্গাম পোহাবার। আনক্লেমড প্রপার্টির আফিসে জমা দিয়ে দিলেই পারতেন। তাছাড়া", গলা খাটো করে মৃদু হেসে যোগ করল অঞ্জন "এত রাত্রে একটি লেডিজ্ ব্যাগ হাতে করে বাড়ি ঢুকলে একগাদা কৈফিয়তের পাল্লায় পড়বেন যে। তার চেয়ে ওটা মা গঙ্গাকে উপহার দিয়ে চলে যান। কী আর এমন দামী জিনিস !"

ঠাট্টাচ্ছলে বললেও অঞ্জনের কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রণতি হয়তো ব্যাপারটাকে ঠিক সহজ ভাবে নেবে না। তাকে চিনি তো, অঞ্জনও কিছুটা জানে। মেয়ে-কলেজে পড়াই, দলে দলে মেয়েরা এটা ওটা উপলক্ষ করে আমার কাছে আসে, কাজ মিটে যাবার পরেও কিছুক্ষণ থেকে যায়, এর কোনোটাই সে পছন্দ করে না। লক্ষ করেছি, গোটা মেয়ে জাতটার উপরেই সে যেন রুখে আছে।

আমার বাইরের ঘরটা একটু একটেরে। ছাত্রীরা এলে সেখানেই বসে। সবাই খুব শান্ত গোবেচারা ভালমানুষ গোছের নয়। কেউ কেউ একটু বেশী চঞ্চল, চেঁচিয়ে কথা বলে, জোরে হেসে ওঠে, যা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয় সে-সব ব্যাপারেও আব্দারের সুরে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। প্রণতি ঘরে কখনো ঢোকেনা, কিন্তু আড়াল থেকে নজর রাখে। তার কথা থেকেই বুঝতে পারি।—"কে ঐ মেয়েটা? শুরু থেকে সমানে ফ্যা ফ্যা করে হাসছিল? তুই হলি ছাত্রী, কাজ নিয়ে মাষ্টারের কাছে এসেছিস, তা, এত হাসির কী আছে?"

আরেক দিন শুনলাম, "অত ইনিয়ে বিনিয়ে কী বলছিল গো ঐ মোটা মত মেয়েটা? যেন অ্যাকিটিং করছে! অত গা ঘেঁষে না দাঁড়ালে বুঝি পরীক্ষার কথা বলা যায় না?"

আমি এগুলো বরাবর উপেক্ষা করে এসেছি। জানি প্রণতির এ এক ধরণের ব্যাধি এবং সেটা কিছুতে সারবার নয়। কথা বাড়াতে গেলে বরং তার প্রকোপ বেড়ে যাবে।

এ হেন স্ত্রীর কাছে এই ভ্যানিটি ব্যাগ কী অর্থ নিয়ে দেখা দেবে ভাববার কথা।

বাইরের ঘরের একটা দরজা রাস্তার উপর। তালা বন্ধ থাকে এবং তার চাবি থাকে আমার কাছে। অনেক সময়, বিশেষ করে ফিরতে যেদিন রাত হয়, সদর গেটে কড়া না নেড়ে আমি ঐখান দিয়ে ঢুকি। আজও তাই করবো স্থির করলাম। ব্যাগটাকে লিখবার টেবিলের দেরাজে বন্ধ করে ভিতরে চলে যাবো। প্রণতি জানতে পারবে না।

দেরাজটা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও আমি যে তার পুরোপুরি দখলিকার নই, ওর ভিতরে একটি গোপন হাতের আনাগোনা চলে, সেটা আমার কাছে গোপন নেই। কয়েক বছর আগে টেবিলটা যখন কেনা হয়েছিল, তখন এক জোড়া চাবি ছিল ওর সঙ্গে। তার একটা যে কোথায় চলে গেল জানতে পারিনি। তা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি। ওখানে এমন কিছুই থাকেনা যা অন্যের প্রয়োজনে লাগতে পারে।

কিছু লেখা, তাও গল্প-উপন্যাস নয়, প্রবন্ধ-জাতীয় অর্থাৎ লোকে যা পড়ে না, কিছু লেখচার নোট্‌স্‌ আর চিঠি পত্তর।

এই শেষোক্ত বস্তুটির উপরেই আরেকজনের আকর্ষণ। সব চিঠি নয়, আমার ছাত্রীরা যেগুলো লেখে। গুছিয়ে সাজিয়ে যে রাখি তা নয়, খুলে পড়ে যেমন তেমন করে ফেলে রেখে দিই। তাহলেও লক্ষ করেছি আমার অসাক্ষাতে সেখানে একটা সতর্ক নাড়াচাড়া চলে।

মেয়েদের চিঠি, তাই নিছক কাজের কথা ছাড়া অন্য কিছুও হয় তো থাকে তার মধ্যে। পাশ করে বেরিয়ে গিয়ে মাষ্টার মশাইকে সস্নেহে স্মরণ করেছে কেউ। কোনো উপকার হয়তো পেয়েছিল, আমার কাছে তুচ্ছ হলেও, তার কাছে মূল্যবান। তারই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি, সুরটি অন্তরঙ্গ।

কোনো মেয়ে সবে ঘর বেঁধেছে, সুখী হয়েছে নতুন সঙ্গীটিকে পেয়ে। কি মনে করে তারই মধুর বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে পুরনো 'স্যরের' কাছে, এই বিশ্বাসে যে 'স্যর'ও তার সদ্যোলব্ধ সুখের অংশ গ্রহণ করবেন।

আরেকটি মেয়ে জীবন যুদ্ধে জর্জর, বুঝতে পারছে না কোন পথে যাবে। তারই নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছে। "আপনি তো আমাদের শুধু অধ্যাপক ছিলেন না। তা যদি হত কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যেত। কলেজের বাইরেও আমরা অনেক কিছু পেয়েছি আপনার কাছে। তাই আজও যখনই কোন সমস্যায় পড়ি, আপনার কথাই সকলের আগে মনে পড়ে।"

প্রণতি হয়তো এই সব উক্তির ভিতর থেকে একটা বিশেষ অর্থ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে এবং তাই নিয়ে দুঃখ পায়। এই মেয়েগুলো তার জীবনের দুগ্রহ। এদের জন্যে সে সুখী হতে পারল না, পেলনা যা তারই একান্ত পাওনা, চিরদিন বঞ্চিত রয়ে গেল।

খোলাখুলি কোন কথা হয়না আমার সঙ্গে। হলে হয়তো ভালো

হত। ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকে। তার কথায়, কাজে, সংসারের সকলের প্রতি নানা আচরণে ছড়িয়ে পড়ে তার ঝাঁজ।

আমি টের পাই, কিন্তু নিরুপায়।

হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোডে পড়ে ব্যাগটা খুলে ফেললাম। ভিতরটায় উঁকি দিতেই চোখে পড়ল একটি সুদৃশ্য কার্ড বোর্ডের বাকস্, চেহারাটা ঠিক গয়নার কেস্-এর মত। ড্রাইভারের নজর এড়িয়ে আস্তে আস্তে বাইরে এনে ডালাটা খুলেই চমকে উঠলাম। ঝলমল করে উঠল একটি দামী নেকলেস!

কী করি এবার? গাড়িটা ঘুরিয়ে থানায় নিয়ে যাবো, না বেওয়ারিশ মালের অফিসে? কিংবা··· ?

নিজের মনের একটি হঠাৎ খুলে-যাওয়া গোপন কক্ষের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম। আমি একজন খ্যাতনামা প্রবীণ অধ্যাপক, ভদ্র, সম্ভ্রান্ত, আদর্শনিষ্ঠ মানুষ, ন্যায়-নীতি-সততার প্রাচীন মূল্যমানে প্রত্যয়ী। আমার ভিতরে এমন একটা চিন্তার আবির্ভাব ঘটল কেমন করে! এ কী করে সম্ভব!

জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম। না, ব্যাগের চিন্তা আর নয়। গোড়ায় যা ভেবেছি, তাই স্থির। রাতের মত একে ড্রয়ারে নিয়ে রাখা। তারপর কি করনীয় কাল ভেবে দেখা যাবে।

ব্রাবোর্ণ রোড পেরিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ার পাড়ায় পড়ে ট্যাক্সি বেগ বাড়িয়ে দিল। রাস্তা প্রায় নির্জন। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও গাড়ি-ঘোড়া-ঠ্যালা-রিকশ-মানুষের কি বিপুল জটলা সারা অঞ্চলটাকে ভয়াবহ করে তুলেছিল! এখানকার এই বিস্তীর্ণ অবাধ প্রশান্তির দিকে চেয়ে সে কথা বিশ্বাস করাই যায় না।

মহানগরীর এই রূপবৈচিত্র্যের কথা ভাবতে ভাবতে মনটা যে কখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, টের পাইনি।

প্রণতি সুখী নয়, তাকে আমি সুখী করতে পারিনি। আমার

ছাত্রীদের নিয়ে তার যে ক্ষোভ সেটা না হয় ছেড়ে দিলাম। কী দিয়েছি তাকে ? জন্মদিনে একটি ভাল উপহার তার অনেক দিনের সাধ। একবার মুখফুটে বলেও ফেলেছিল "এবার একটা হার দিও আমাকে।" হাতে দুগাছা সরু চুড়ি লিক লিক করছে, কানে একটা ক্ষয়ে যাওয়া দুল। গলাটা একদম খালি! প্রণতির স্বাস্থ্য আছে, সুঠাম দেহ। কণ্ঠার নীচের অংশটা বেশ প্রশস্ত ভরাট, ভালো একটা হার পরবার জন্যেই যেন তৈরী। কোথাও বেরোবার আগে একটা অনেক দিন আগে গড়ানো সরু চেন পরে বেরোয়। একেবারেই মানায়না ওকে।

পরের জন্মদিনেও তার বহুদিনের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। সামান্য কিছু প্রসাধন দ্রব্য দিয়েই কোনো রকমে নিয়ম রক্ষা করেছিলাম। তার সেই নৈরাশ্য-ম্লান মুখখানা চোখের উপরে ভাসছে।

আজ সে মুখে আমি অনায়াসে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি। জন্মদিনের আর বেশী দেরি নেই, আজই গিয়ে বলতে পারি, তুলে রাখো, ঐদিন পরো।

সে ভীষণ খুশী হবে কিন্তু বাইরে একটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে বলবে এমন একটা দামী নেকলেস কে আনতে বলেছিল তোমাকে ? আর এত আগেই বা কেন ?

উত্তরে আমি বলবো—"সেই যে নতুন নোটটা লিখেছিলাম, তার জন্যে কিছু টাকা দিল পাবলিশার। ঘরে আনলেই তো খরচ হয়ে যাবে, তাই সঙ্গে সঙ্গে জুয়েলারের দোকানে চলে গেলাম।"

একটি দীর্ঘলালিত আকাঙ্ক্ষা-পূরণের তৃপ্তিময় ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠবে প্রণতির মুখে। কল্পনার চোখে দেখে নিলাম। সে যে এত সুন্দর তাতো কখনো জানতাম না।

এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম, যে যন্ত্র-চালিতের মত হারের কেসটা বের করে কখন পকেটে পুরে ফেলেছি, ঠিক বলতে পারবোনা। গাড়ি তখন রেড রোড ধরে চলেছে। ব্যাগটা ফেলে দেবার উপযুক্ত জায়গা। কেউ দেখবে না, ড্রাইভারও জানতে পারবে না। টুক

করে একটু শব্দ হবে, এঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে সেটা ওর কানে পৌঁছবেনা।

দরজার কাঁচ নামানো ছিল। সেখান দিয়ে হাত গলিয়ে ফেলতে যাবো, হঠাৎ হাতের উপরে কে যেন সজোরে একটা চাবুকের ঘা বসিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম।

বিজ্ঞাপন বেরোবার দুদিন পরেই সেই মেয়েটি এল। কোণের দিকে যে ছিল সে নয়, তার পাশে যে বসেছিল। আমি বাধা দেবার আগেই এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল, আমাকে বোধহয় আপনি চিনতে পারবেন না। আমি আপনার ছাত্রী ছিলাম। অবিশ্যি তিন চার মাসের বেশী আপনার ক্লাস করতে পারিনি।

"তারপরে বুঝি সাবজেক্ট পালটালে?"

"না, স্যার, কলেজই ছেড়ে দিতে হল।"

"ও, তোমার নামটি কী বলতো?"

"রেখা, রেখা পালিত।"

"তোমার পাশে যে বসেছিল, ও কি আমাদের কলেজে পড়ত?"

"না, ও পড়েছে স্কটিশে। আমার বন্ধু।"

"ভীষণ বন্ধু, বল। যে-ভাবে জমে গিয়েছিলে দুজনে।"

আপনি লক্ষ করেছিলেন বুঝি? আমি কিন্তু আপনাকে একদম দেখতে পাইনি।"

"ব্যাগটা কার? তোমার না ওর?"

"আমার। সানু নিয়ে রেখেছিল ওর পাশে। আমি জানি, ও-ই নিয়ে নামবে। ষ্টেশনের বাইরে এসেও কারো খেয়াল হয়নি। বাস্-এ উঠে বেশ কিছু পথ চলবার পর সানুই বলল, ব্যাগ কই? তারপর নেমে ট্যাকসি করে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি সে গাড়িটাই নেই।"

"আমিও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তোমাদের জন্যে অপেক্ষা

করলাম। খানিকটা এগিয়েও এলাম গেটের দিকে। তারপর ভাবলাম, নিয়ে যাই ! ঝাড়ুদারের হাতে পড়লে তো আর—"

"ভাগ্যিস নিয়ে এসেছিলেন।"

"কোত্থেকে আসছিলে তোমরা ?"

"বর্ধমান থেকে। আসবার সময় মা আবার একটা গয়না চাপিয়ে দিল। বৌদির গয়না। ভেঙে গড়তে দিয়েছিল মার কাছে। ওখানে আমাদের খুব বিশ্বাসী স্যাকরা আছে কিনা।"

রেখা একটু উসখুস করছে দেখে বললাম, আচ্ছা, আর তোমাকে আটকে রাখবোনা।

সে বলল, আরো কিছুক্ষণ বসতাম। কিন্তু ওদিকে বৌদির অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। এখান থেকে সোজা যেতে হবে তার কাছে। সানু বেচারা তো ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছে। তাকেও খবরটা জানিয়ে দিতে হবে।

উঠে গিয়ে ড্রয়ার খুলে ব্যাগটা এনে রেখার হাতে দিলাম। সে উঠে পড়েছিল। বাধা দিয়ে বললাম, আগে খুলে ছাখ সব ঠিক আছে কিনা।

"কী যে বলেন, স্যার ! দেখবো আবার কী ?"

"না ; তাহলেও একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।"

রেখা ব্যাগ খুলল। সঙ্গে সঙ্গে, লক্ষ করলাম, কে যেন তার সারা মুখটায় এক পোচ কালি মাখিয়ে দিল। বসে পড়ে পাগলের মত ভিতরটা হাতড়াতে লাগল। বললাম, কী হল !

"গয়নার কেসটা তো নেই।"

"অ্যাঁঃ, বল কি !"

উঁকি মেরে ভিতরটা এক পলক দেখে নিয়ে আমিও বসে পড়লাম। বলবার মত কোনো কথা পেলাম না।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে রেখা উঠল। বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আপনার চোখে পড়বার আগেই কেউ ওটা সরিয়ে ফেলেছে। যাক, আপনাকে মিছিমিছি হয়রান হতে হল।

রেখা বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। না, না, এ হতে পারে না। গয়না ওকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। কে নিয়েছে, চোখে না দেখলেও আমি তো জানি।

কিন্তু সে যদি অস্বীকার করে? করলেই হল। সোজা চার্জ করবো, খোলো তোমার বাক্স প্যাঁটরা কোথায় কি আছে, আমি দেখতে চাই।

রেখাকে ডেকে ফেরাবার জন্যে দরজার দিকে ছুটে গেলাম। কয়েক পা বাড়িয়েই কেমন যেন মুষড়ে গেল ভিতরটা। চার্জ করবার মত জোর বা অধিকার কি আমার আছে? তার থেকে আমার তফাৎ কোথায়?

হ্যাঁ, আছে তফাৎ। আমি ভীরু বলে নিয়েও নিতে পারিনি, তার বুকের পাটা বড়, তাই সে অনায়াসে তুলে নিয়েছে।

ক্ষতিপূরণ

তখন বহরমপুরে আছি। মাঝে মাঝে সরকারী প্রয়োজনে কলকাতা আসতে হয়। সেক্রেটারিয়েটের প্রভুরা তলব করেন। যখন দেখি বেশ কিছুদিন ডাক পড়ছে না, তখন জরুরী কনসালটেশন বা ঐ জাতীয় একটা কোনো উপলক্ষ তৈরি করে নিজেই চলে আসি। সেও তো সরকারী কাজ।

যখনই আসি আমার সব চেয়ে প্রিয় গাড়ি দুপুর বেলার লালগোলা প্যাসেঞ্জার। খাওয়াদাওয়া সেরে একটার কিছু পরে উঠে পড়ি। শিয়ালদয় এসে নামি রাত আটটার কাছাকাছি।

বন্ধুরা বলেন, দুপুর রোদে তেতেপুড়ে না এসে সকালে বা বিকেলে বেরোলেই পার।

তা হয়তো পারি। কিন্তু টাইম-টেবল ঘেঁটে দেখেছি, তাতে করে দৈনন্দিন দিবানিদ্রাটি সেরে নেবার মত একটি পুরো দুপুর হাতে পাওয়া যায় না।

ছোট বড় সব চাকরেদের জীবনে ঐ বস্তুটি বড় দুর্লভ, সপ্তাহান্তে এক দিন। তাও ছুটির দিন বলে কত রকম বাজে কাজ এসে জোটে। কিন্তু ভাগ্যবলে আমি এমন একটি রাজ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, যেখানে চাকরির অন্য সব দুঃখ যতই থাক, দিবানিদ্রার নিত্য অবসর। একটা দিনই বা সে সুযোগ নষ্ট করি কেন?

নির্বাধ নিদ্রার পক্ষে ঐ ট্রেনটি ছিল একেবারে আদর্শ। মন্দগতি প্যাসেঞ্জার বলে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা ওর দিকে সাধারণতঃ নজর দিতেন না। আমার পক্ষে সেটাই সুবিধা।

যখনকার কথা বলছি তার কিছুদিন আগেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, কিন্তু তার সুখসুবিধাগুলো সরকারের কাছ থেকে পুরোপুরি আদায় করতে শিখিনি। অর্থাৎ রেল তো আমাদের

জাতীয় সম্পত্তি,—এই অধিকারে টিকিট কাটার হীনতা স্বীকার না করে সদলবলে ফার্স্ট ক্লাস দখল করা—অতটা অগ্রসর হইনি।

ফার্স্ট ক্লাসে যারা যেত টিকিট করেই যেত। ঐ লাইনে, বিশেষ করে ঐ ট্রেনটায় আপ স্টেশন থেকে সে রকম প্যাসেঞ্জার বড় একটা উঠত না। বহরমপুরে যখন আসত, প্রায়ই দেখতাম, কামরাগুলো ফাঁকা।

সেবার আশ্বিনের শেষ দিকে মন্ত্রীমহাশয় আমাদের নিয়ে একটা কনফারেন্স আহ্বান করলেন। তার আগের দিন যথারীতি ধীরে সুস্থে স্টেশনে এসে একটি 'কুপে' দখল করে বসলাম। পাশের চার বার্থ-ওয়ালা কামরাটিও একদম খালি। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে দরজা দু'টো 'লক' করে দিলাম। কাঠের খড়খড়িগুলো নামিয়ে দিতেই ছোট্ট কম্পার্টমেণ্টে বেশ একটা 'রাত্তির রাত্তির' ভাব এসে গেল। পাখা চালিয়ে শার্ট ট্রাউজার ছেড়ে শুধু একটা লুঙি আশ্রয় করে সটান শুয়ে পড়লাম। পড়া মাত্র চোখ বুজে এল।

একটানা কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম খেয়াল নেই। মাথার কাছে দুমদাম শব্দে আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল। টের পেলাম একটা কোন স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বাইরে থেকে কে দরজা পিটছে। তখনো হঠাৎ-ভাঙা ঘুমের মধুর আমেজটুকু দুচোখে জড়িয়ে আছে। সাড়া না দিয়ে চুপ করে পড়ে রইলাম। কতক্ষণ আর পিটবে? সাড়া না পেলে পাশের কামরায় চলে যাবে। ওটা ছাড়াও ওদিকে আরেকখানা ফার্স্ট ক্লাস কামরা রয়েছে। জায়গাও আছে নিশ্চয়। সব ফেলে আমার উপর এ উৎপাত কেন?

নাঃ, লোকটা দেখছি নেহাৎ নাছোড়বান্দা। এক নাগাড়ে ঘা দিয়েই চলেছে। না খুলিয়ে থামবে না। আমারও কেমন মজা লাগল। দেখি কদ্দুর ওর দৌড়। কিন্তু কাজটা তো বে-আইনী হচ্ছে। কুপেটা আমি রিজার্ভ করিনি। তাছাড়া দিনের বেলায় রিজার্ভেশন চলে না। প্যাসেঞ্জার থাকলে জায়গা দিতে আমি বাধ্য।

উঠে পড়লাম। কিন্তু দরজা খোলবার আগে একটু সভ্য ভব্য হয়ে নিতে হবে তো। খালি গা, কোমরে কোন রকমে জড়ানো আধময়লা লুঙি। এই মূর্তি নিয়ে একজন ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার লোকজনের সামনে বেরোয় কেমন করে? মহিলা-টহিলা-ও তো থাকতে পারে দু-একজন।

এদিকে মনে হচ্ছিল দরজাটা বোধহয় খুলবার দরকার হবে না। তার আগেই ভেঙে পড়বে।

গেঞ্জিটা মাথায় গলাতে গলাতে স্যাণ্ডাল টেনে টেনে এগিয়ে গিয়ে লক্ খুলে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই পাল্লাটা দড়াম করে খুলে গেল। প্ল্যাটফরমটা একটু নীচু। সেখানে দাঁড়িয়ে এক রুদ্র মূর্তি। রক্ত চক্ষু পাকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত আস্ফালন করে হুঙ্কার দিল—"হোয়াট্ ডু ইউ মীন?"

জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই (জবাব দেবার আছেই বা কী?) আবার সগর্জনে ফেটে পড়ল সেই প্রশ্ন—আই সে, হোয়াট্ ডু ইউ মীন?

আমি নিরুত্তর। এবার ভাষার পরিবর্তন হল, ইংরেজী থেকে বাংলা—বলি, পেয়েছেন কী? কামরাটা কি আপনার পৈতৃক সম্পত্তি?

এবার একটা উত্তর দিতে হল, কী যা-তা বকছেন! খুলে তো দিলাম। উঠতে হয় উঠে পড়ুন না।

"সেটা আর আপনাকে কষ্ট করে বলে দিতে হবে না।" মুখ বিকৃত করে ব্যঙ্গের সুরে কথাগুলো যেন ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। তারপরেই বাঁহাতের অ্যাটাচি কেসটা তুলে ধরে বলল, "ধরুন"। যেন চাকর-বাকরকে হুকুম করছে।

কী করি, ধরতে হল। তা না হলে অতটা নীচু থেকে মোটা দেহ নিয়ে উঠে আসা তার পক্ষে অসম্ভব। ওদিকে আবার গার্ডের হুইস্‌ল্ শোনা যাচ্ছে।

চেহারায় বেশ ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত। বয়স পঞ্চাশের উপর। মোটা

তো বটেই, তার উপরে বেঁটে। ফর্সা রং, বুলডগপানা মুখ, ভাঁটার মত চোখ, তখনো লাল টকটক করছে। ছাঁটা গোঁফ, কামানো দাড়ি। গায়ে সাদা হাওয়াই শার্ট, ঘামে ভিজে জবজবে। কপালেও এক রাশ ঘাম। মুছে নিয়ে হাত ঝাড়া দিল। চট করে সরে না গেলে আমার গায়ে গিয়ে ছিটকে পড়ত।

উপরের দিকে তাকিয়ে পাখাটা দেখে নিল। তারপর আমার বিছানাটা একটানে সরিয়ে দিয়ে পাখার ঠিক নীচে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। আমি কাঠের খড়খড়িটা তুলে দিয়ে জানালার ধার ঘেঁষে বসে বাইরের দিকে নজর দিলাম। ঘুমটা পুরো হয়নি, মাঝপথে এই চীজ। মনটা ভিতরে ভিতরে খিঁচড়ে রইল।

ভদ্রলোক বোধহয় খানিকটা দম নিয়ে আবার শুরু করল—"নাউ, আই ওয়ান্ট্ টু নো, আমি জানতে চাই, গোটা কম্পার্টমেন্ট দখল করে বসবার কী অধিকার আছে আপনার?"

বিরক্তির সুরে বললাম, "আপনারই বা কী দরকার ছিল এখানে উঠবার? পাশের কামরায় অনেক জায়গা পড়ে ছিল।"

—"আমার খুশি আমি উঠবো। আমি কোথায় উঠবো কি না উঠবো, আপনি ডিকটেট্ করবার কে? জানেন, আপনাকে আমি পুলিসে হ্যাণ্ড্ওভার করতে পারতাম?"

"পুলিসে!"

—"হ্যাঁ স্যার, পুলিসে।"

মুখ ভেংচে বললে বুড়ো। তার সঙ্গে যোগ করল, দিস ইজ অ্যান অফেন্স আণ্ডার দি রেলওয়ে অ্যাক্ট্।

বুঝতে আর বাকি রইল না, একটি পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

কৌতুকের সুরে বললাম, "করলেন না কেন?"

"—করলাম না আমার ইচ্ছে।"

"বেশ, এবার তা হলে চুপ করুন। খালি খালি চেঁচামেচি করবেন না।"

—"হোয়াট! আই টেক সিরিয়াস একসেপশান টু ছাট ওয়ার্ড—চেঁচামেচি। আমি চেঁচামেচি করছি?"

বলে, আবার সেই সিংহ গর্জন। তার পরেই হঠাৎ কেমন যেন মিইয়ে গেল। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে জুতোসুদ্ধ পা তুলে শুয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললাম, "কী হল! অসুস্থ বোধ করছেন?"

"সে খবরে আপনার কী দরকার?" আপনি কি ডাক্তার?"

এর পরে আর কি বলা যায়?" গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এল। বুঝলাম স্টেশন আসছে। আমার সহযাত্রী মাথা না তুলেই বলল, "একটা উপকার করতে পারবেন?"

একেবারে অন্য সুর। সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে বললাম, "কী, বলুন।"

"আমার সঙ্গে একটা লোক আছে। নাম বসন্ত। এই কাছেই কোথাও উঠেছে থার্ড ক্লাসে। গাড়ি থামলে একবার যদি ডেকে দেন। ওর কাছে আমার ওষুধ আছে।"

গাড়ি এসে বীরনগরে দাঁড়াল। ছোট স্টেশন। মিনিট খানেক হয়তো থামবে। কিন্তু কী করি? নেমে পড়ে চেঁচাতে শুরু করলাম, "বসন্ত কে আছ? বসন্ত।"

এঞ্জিন পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। কেউ সাড়া দিল না। তখন ভাবলাম, ওদিকের কোনো গাড়িতে হয়তো আছে। ফিরলাম; কিন্তু আমার 'কুপে' পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ট্রেন চলতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যে কামরা পেলাম উঠে পড়লাম। বলা বাহুল্য সেটা তৃতীয় শ্রেণী। বেঞ্চিগুলোতে লোক ঠাসা। প্যাসেজ এবং দরজার সামনেটাও ভর্তি। তারই মধ্যে কোনো রকমে দেহটাকে গলিয়ে দিলাম।

পরের স্টেশন রানাঘাট। বসন্তকে খুঁজে বের করতে হবে। তার আর দরকার হল না। নিজের কামরার সামনে এসে দেখলাম, ভিতরটা একদম খালি। ভাবলাম, সহযাত্রীটি বাথরুমে গেছে হয়তো। উঠে দেখলাম, না বাথরুমের দরজা খোলা, সেখানে কেউ নেই।

একটু ভাবনা হল। অসুস্থ শরীরে কোথায় গেল লোকটা? এখানে নামলে তো দেখতে পেতাম। বীরনগরে নেমে গেছে। মনে মনে হাসলাম, পাগল আর কাকে বলে। নামবেই যদি, কী দরকার ছিল আমাকে এভাবে দৌড় করাবার?

এখান থেকেই এ গাড়িটায় কিছু কিছু ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার উঠতে থাকে। পরের স্টেশনগুলোতে আর জায়গা থাকে না। নামার পালা নেই, শুধু ওঠা। গাড়িটা যেন হঠাৎ পণ করে বসে, রাস্তায় কাউকে ছাড়া হবে না। যেখানে যত লোক পাবে কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে গিয়ে ঢেলে দেবে শিয়ালদয়।

পায়রাডাঙ্গা না চাকদয় একটি চেনা উকিল উঠলেন। তার সঙ্গে গল্পে গল্পে পৌঁছে গেলাম।

আমার সঙ্গে লাগেজ বলতে ছিল একটা ছোট বিছানা আর একটি ফোলিও ব্যাগ। সেটি রেখেছিলাম উপরের বার্থএ। লোকজন নেমে গেলে বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে উপরে তাকিয়েই চক্ষুস্থির! ফোলিও উধাও।

তখন অনেক কথাই মনে হল। ঐ রকম একটা লোককে অতটা বিশ্বাস করা বোকামি হয়েছিল। সঙ্গে তো তার একটা অ্যাটাচি কেস্ ছিল। ওষুধ থাকলে তার মধ্যেই থাকতে পারত, অন্য লোকের কাছে রাখতে যাবে কেন? যখন গাড়িতে ওঠে লোকজন তো কাউকে দেখা যায়নি। তাহলে ওটা নিছক ধাপ্পা।

ব্যাগে কিছু দরকারী কাগজপত্র ছিল। কনফারেন্সের জন্যে তৈরী নোট এবং অন্যান্য তথ্য যার অভাবে মন্ত্রী এবং বিভাগীয় কর্তাদের সামনে শুধু অপ্রস্তুত নয় বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়তে হবে। আরেকটা জিনিস ছিল এবং সেখানেই মোক্ষম ঘা দিয়ে গেছে লোকটা। একখানা খামের মধ্যে চারশ টাকা!

গৃহিনী বলেছিলেন, কলকাতায় যখন যাচ্ছ, পূজোর কেনাকাটা কিছুটা সেরে এসো। এখানে তো ঐ একই জিনিস দেড়া দাম দিয়ে কিনতে হবে।

একটা ফর্দও করে দিয়েছিলেন। সেটি অক্ষত দেহে আমার ট্রাউজারের পকেটে বিরাজমান।

অতগুলো টাকা আমার কাছে অল্প নয়। বিশেষ করে পূজোর মুখে। তবু সেই মুহূর্তে বুকের মধ্যে যে জিনিসটা খচখচ করতে লাগল সেটা টাকার শোক নয়, লজ্জা। এতকাল এত ক্রিমিন্যাল নিয়ে ঘর করলাম, ঐরকম একটা উটকো লোক সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ হল না! অতগুলো টাকা রেখে পরোপকার করতে নেমে গেলাম! লোকে শুনলে বলবে কী?

এসব ব্যাপারে জি. আর. পি থানায় ডায়েরী করা নিয়ম। না করেই চলে গেলাম। সামান্য একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্‌স্‌পেকটর মুখে সহানুভূতি দেখাবে আর মনে মনে মুখ টিপে হাসবে—টাকার ক্ষতির চেয়ে সেটা আরো অসহ্য।

পার্সটা ভাগ্যিস সঙ্গে রেখেছিলাম। তা না হলে শিয়ালদ থেকে উল্টোডাঙ্গা দাদার বাসা পর্যন্ত হণ্টন ছাড়া গতি ছিল না।

ব্যাপারটা কাউকে বলবার নয়, বলিওনি। গৃহিণীর কাছেও চেপে গেলাম। এমনিতেই আমার অমনোযোগ, অসাবধানতা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য তিনি সর্বদা করে থাকেন, তার উপরে এমন একটা অস্ত্র নিজে থেকে আর তাঁর হাতে তুলে দিই কেন?

ফিরে এসে ফর্দটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, অনেক কাজ ছিল, বাজারের দিকে আর যেতে পারিনি।

মাসখানেক পরে একদিন একটি রেজিস্টার্ড প্যাকেট এল আমার নামে। খুলে একেবারে থ। সেই ফোলিও ব্যাগের কাগজগুলো। নাড়া চাড়া করতে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একখানা চিঠি। লেখাটা একটু জড়ানো, কিন্তু পড়তে বিশেষ অসুবিধা হল না। চিঠিতে লেখকের নাম ঠিকানা নেই।

প্রিয় মহাশয়

কাগজগুলো আপনার অফিস-সংক্রান্ত। খোয়া গেলে ক্ষতি হইতে পারে। সেইজন্য ফেরৎ পাঠাইলাম। আরও পূর্বে পাঠাইতাম। শারীরিক অসুস্থতা বশত বিলম্ব হইয়াছে।

কয়েক বৎসর যাবৎ রক্তের চাপ (হাই ব্লাডপেশার) রোগে ভুগিতেছি। ডাক্তারের নির্দেশ, কোনরূপ উত্তেজনার কারণ না ঘটে। সেদিন যে অতটা উত্তেজিত এবং তাহার ফলে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহার কারণ আপনি। গাড়ির দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া দিলে আমার এই দুর্ভোগ ঘটিত না।

এই একমাস যাবৎ চিকিৎসা পথ্য এবং চেঞ্জ ইত্যাদি বাবদ চারশ টাকার উপর খরচ হইয়াছে। ন্যায়ত তাহা আপনার দেয়। সরাসরি দাবি করিলে আপনি নিশ্চয়ই দিতেন না। সেই জন্যই টাকাটা আমাকে কৌশলে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

আশা করি ক্ষমা করিবেন। নমস্কার।

ইতি—

পুনশ্চ—আপনার নাম ঠিকানা, ফোলিওর উপরে আপনার যে কার্ড লাগানো রহিয়াছে, তাহা হইতে পাইয়াছি।

হ্যাংম্যান

কাল ভোরবেলা আলি হোসেনের ফাঁসি। গত মাসখানেক ধরে চলেছে তার প্রস্তুতি পর্ব।

বিচারক তো দণ্ড দিয়েই খালাস। তার পর থেকে শুরু হল আমাদের কাজ—আমরা যারা জেল আগলে আছি—এবং তা চলতে থাকবে যতক্ষণ না খালাস পাচ্ছে সেই দণ্ডিত কয়েদী, কখনো জেল থেকে, কখনো বা দুনিয়া থেকে।

আলি হোসেন চলে যাচ্ছে দুনিয়া থেকে। খানদানি ঘরের ছেলে। নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল চাচাতো বোনকে। সুন্দরী, অনুগত স্ত্রী। হঠাৎ কী হল। মাস তিনেক না যেতেই দিল শেষ করে। সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়ে বলল, বৌকে খুন করে এলাম, যা করবার করুন। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। এর বেশী আর কোনো কথাই বেরোয়নি তার মুখ থেকে। থানায় না, কোর্টে না, উকিল বা আত্মীয় স্বজনের কারো কাছেই না। বলেছে, 'কেন' দিয়ে কী দরকার আপনাদের? করেছি, এইটুকু পেলেই তো হল।

না করেছে আপীল না পাঠিয়েছে মারসি পিটিসান (mercy petition)। হেসে বলেছিল, একটি মাত্র মারসি শুধু চাইবার আছে। যত শীগগির পারেন ঝুলিয়ে দিন।

সেদিক দিয়ে আমাদের ত্রুটি হয় নি। আপীল-টাপীলের ফ্যাকড়া না থাকায় ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে।

তাহলেও ফাঁসির একটা আয়োজন আছে এবং সে পর্বটি মোটেই ছোট নয়। সারাদিন ধরে তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তার পরেও কোথাও কোনো ছিদ্র রইল কিনা আরেকবার খতিয়ে দেখবার জন্যে রাত নটার সময় হাজির হলাম জেল খানায়।

ফটক পেরিয়ে দু গেট-এর মাঝখানে যে প্রশস্ত জায়গা সেখানে

পা দিতেই একটা লোক হন হন করে এগিয়ে এল—"সেলাম হুজুর। আমাকে একটু বেরোবার হুকুম দিন। যাবো আর আসবো।"

"কে তুমি?"

"আজ্ঞে আমি মধু, মধু দাস, হ্যাংম্যান।"

ঢ্যাঙা, কালো রোগামত লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলাম। মাথায় টেড়ি, পরনে ফর্সা হাফ্ শার্টের নিচে অপেক্ষাকৃত ময়লা ধুতি, পায়ে স্যাণ্ডাল, চোখে-মুখে ব্যস্ততা। ভোরবেলা একজিকিউশান নামে যে মহাযজ্ঞ উদ্‌যাপিত হতে চলেছে তার প্রধান হোতা এই হ্যাংম্যান্। মোটা ম্যানিলা রজ্জু দিয়ে তৈরী যে কঠিন ফাঁসটি সযত্নে রাখা আছে আমার আলমারীতে, ফাঁসি মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সেটা আলিহোসেনের গলায় পরিয়ে দেবার অত্যাবশ্যক কাজটি ওর।

ফাঁসি পর্বের অনুষ্ঠানে আমাদের প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। জেলের অধ্যক্ষ অর্থাৎ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলর, ডেপুটি জেলর, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, চীফ হেড্‌ওয়ার্ডার এবং সশস্ত্র বাহিনী। তাদের মধ্যে কেউ অনুপস্থিত হলে তার কাজ অন্য কাউকে দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু মধু দাসের কোনো বিকল্প নেই। ফাঁস পরাবার জন্যে তার কিছু প্রাপ্তি আছে—নগদ বত্রিশ টাকা। জেল-সুপারের সই করা চিঠি পেয়ে সে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে গেছে এবং আজও সন্ধ্যার পরেই এসে হাজির হয়েছে। তার দায়িত্ব সম্পর্কে সে সজাগ। কিন্তু সে তো কয়েদী নয় যে বাইরে যাবার জন্যে আমার অনুমতি দরকার।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে গেট্ কীপারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। সে বলল, বড় জমাদার সাহেব ওকে গেট্-এ আটকে রাখতে বলে গেছেন।

"কেন?"

উত্তর দিল মধু—"পাছে মদ-টদ খেয়ে আসি, এই ভয়ে। বুঝুন

একবার! আমার কি সে জ্ঞান নেই? এত বড় একটা দায়িত্ব রয়েছে মাথার উপর।”

“বাইরে যেতে চাইছ কেন?”

“ছেলেটার অসুখ, একবারটি দেখে আসবো। এই তো কালীঘাটে আমার বাসা। আধঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বো।”

তখনো ইতস্ততঃ করছি দেখে বললে, “হুজুর নতুন ঢুকেছেন জেল খানায়। আমাকে দেখেন নি। তামাম জেল-ডিপার্টের সব বাবুরা আমাকে চেনেন। সবখানেই আমাকে যেতে হয় তো। এই আমার পেশা। আমার বাবাও এই কাজ করে গেছেন। আমরা জাতিতে ডোম, কিন্তু কোন ছোট কাজ করি না। মদ-টদ একটু খাই। হুজুরের কাছে মিছে কথা বলবো না। কিন্তু তাই বলে আজ!”

দাঁতে জিভ কেটে দু-কানে হাত দিল মধু ডোম।

আমাদের বড় জমাদার অর্থাৎ চীফ্ হেড ওয়ার্ডার রাম অবতার সিং লোকটি সব ব্যাপারেই অতি-সাবধানী। প্রায়ই দেখেছি যেখানে ধরে আনা প্রয়োজন, সেখানে সে বেঁধে আনে। অতিরিক্ত কর্তব্য পরায়ণ! এটাও তারই একটা দৃষ্টান্ত বলে মনে হল। তাছাড়া ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ এই লোকটাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক করে রাখবার কী অধিকার আছে আমাদের?

মধুকে বললাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরবে তো?

“হ্যাঁ, হুজুর, তার আগেই চলে আসবো। শুধু ছেলেটাকে এক নজর দেখা।”

আমার সরকারী কোয়ার্টারের সদর দরজায় দুমদাম্ শব্দ এবং সেই সঙ্গে রিজার্ভ-ওয়ার্ডারের বাজখাঁই গলা। ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। জেলর আপশন সাহেবের জরুরী তলব। একরকম ছুটে গিয়ে জেল গেট্-এ ঢুকতেই গম্ভীর রুক্ষ প্রশ্ন—হ্যাংম্যানটাকে তুমি বাইরে যাবার পারমিশন দিয়েছিলে?

“হ্যাঁ স্যার। এখনো আসে নি?” বলে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে

বুকের ভিতরটা যেন জমাট বেঁধে গেল। রাত বারোটা চল্লিশ। আপশন বললেন, "নো ; অ্যাণ্ড আই অ্যাম্ সারটেন, হি ওন্‌ট্ টার্ন আপ্ টু-নাইট্।"

"তার বাড়িতে একবার—"

"সেখানে নেই।"

"তার ছেলের অসুখ বলেছিল।"

"ওরকম বলে থাকে।"

কাছে একখানা চেয়ার ছিল। হাতে একটা অসহায় ভঙ্গি করে সেখানে বসে পড়ে জেলর সাহেব বললেন, "নাউ, হোয়াট টু ডু ?"

এটা প্রশ্ন নয় হলেও, আমাকে নয়। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, "এক কাজ কর। রিং আপ ইওরোপীয়ান ওয়ার্ডার এডওয়ার্ড ইন্ দা প্রেসিডেন্সি জেল। আমার নাম করে বল, এখখুনি যেন চলে আসে। ও একবার একটা ফাঁসি দিয়েছিল। হয় তো কোনো রকমে কাজটা চালিয়ে দিতে পারে।"

ভাগ্য ক্রমে এড্‌ওয়ার্ডের তখন নাইট ডিউটি এবং জেল গেটেই তাকে পাওয়া গেল। আমার কথায় আসতে চায় না। আপশন গিয়ে অনেক করে বলতে শেষ পর্যন্ত রাজী হল। কিন্তু আমতা আমতা করে বলল, "পারবো কি ? নাট্‌টাকে ঠিকমত প্লেস্ করা। যদি এদিক ওদিক সরে যায় ?"

জেলর ভরসা দিলেন, "যায় যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মরবে না, কিছুক্ষণ ছটফট করবে, এই তো ? তা করুক। হোয়াট্‌স্ দা হার্ম ?"

কথা হল, রাত ঠিক তিনটায় হাজির হবে এড্‌ওয়ার্ড।

বাসায় আর ফেরা হল না। বাকী রাতটা অফিসে বসেই কেটে গেল। লজ্জায়, দুর্ভাবনায় এবং কী এক আশঙ্কায় সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার হবে কি ? যদি না হয় ?

সাড়ে তিনটায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে পড়লেন। সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেট্। আফিসে ঢুকেই জেলরকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রথম

প্রশ্নই হল, হ্যাংম্যান আছে তো? বাইরে থেকেই তাঁর গলা শুনতে পেলাম এবং বুঝলাম, এবার আমার ডাক পড়বে। পড়ল না। সম্ভবতঃ সময় ছিল না বলে। তখন সকলেরই চিন্তা, আগে আসল ব্যাপারটা মিটে যাক। আমার ব্যাপারটা পরে আসবে এবং যে কঠিন রূপ নিয়ে আসবে তার পূর্বাভাস, মনিব বেরোতে গিয়ে যে দৃষ্টিবাণ আমার প্রতি নিক্ষেপ করলেন, তার মধ্যেই পাওয়া গেল।

আমরা সদল বলে ফাঁসি প্রাঙ্গণে এসে পড়লাম। মাঝখানে উঁচু ঢিপির উপর সজ্জিত ফাঁসি মঞ্চ লোহার পাত দিয়ে ঢাকা। দুধারে দাঁড়িয়ে দুটো লোহার পোস্ট এবং তার উপরে আড়াআড়ি ভাবে লাগানো একটা লোহার রড্। তারই সঙ্গে ঝুলছে মোটা দড়ির ফাঁস। তার একদিকে একটা নট্ বা গিট্ লোহার বলের মত শক্ত। ওরই কথা বলছিল এড্ওয়ার্ড। কয়েদীকে যখন চোখমুখে-ঢাকা টুপি পরিয়ে, পিছন দিকে হাতকড়া লাগিয়ে ঐ পাতের উপর এনে দাঁড় করানো হবে, হ্যাংম্যান তার গলায় পরিয়ে দেবে ফাঁস। এমন ভাবে পরাবে, ঐ শক্ত বলের মত নট্টা যেন ঠিক ঘাড়ের উপর থাকে, যাতে করে লোকটা যখন ঢিবির ভিতরকার গর্তের মধ্যে পড়ে যাবে, এই কঠিন গিঁটটা তার ঘাড়ের হাড় ভেঙে দিতে পারে। তা না হলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে না।

হ্যাংম্যানের কৃতিত্ব ঐ খানে।

ওদিকে কন্‌ডেম্‌ড্ সেল্-এর সামনে আলিহোসেন তার শেষ স্নান সেরে নিয়েছে। বাইরে থেকে এই উপলক্ষে যে মৌলবীকে আনা হয়েছে, শোনা যাচ্ছে তার অনুচ্চ উদাত্ত কণ্ঠের কোরাণ পাঠ। এদিকে দৃশ্যপট প্রস্তুত। রিজার্ভ চীফ হেডওয়ার্ডার মকবুল খাঁর নেতৃত্বে সশস্ত্র ফোর্স "অর্ডার আর্মস্" পোজিসনে দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্চের উপর 'নায়কের' আবির্ভাব ঘটলেই শোনা যাবে তার গম্ভীর কমাণ্ড্—"প্রেজেণ্ট্ আর্মস্।" কী তার তাৎপর্য জানি না। সম্ভবতঃ মৃত্যু পথযাত্রীর উদ্দেশে কারা বাহিনীর শেষ অভিবাদন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর ঘোষ ওয়ারেণ্ট হাতে অপেক্ষা করে

আছেন। দায়রা বিচার পতির দণ্ডাদেশ। শেষ বারের মত দণ্ডিতকে সেটা পড়ে শোনানো হবে। সুপারের ডান পাশে দাঁড়িয়ে নিখুঁত ইউনিফর্মে সজ্জিত জেলর এবং আমরা তাঁর ডেপুটির দল। সেল থেকে ভেসে আসা কোরাণ পাঠ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। সব স্তব্ধ নিথর।

হঠাৎ পিছনে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল। একজন সিপাই এবং সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়ল মধু ডোম—"আ গিয়া হুজুর।" কথাগুলো একটু জড়ানো। জেলর স্থান কাল ভুলে গিয়ে দাঁত কড়মড় করে একটা অভ্যস্ত অশ্রাব্য গালি উচ্চারণ করলেন। মধু যেন শুনতে পায় নি এমনি ভাবে এগিয়ে এসে বড় সাহেবের সামনে ফৌজী কায়দায় লম্বা স্যালুট দিয়ে দাঁড়াল। তিনি ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "পারবে?"

"নিশ্চয়ই পারবো।"

এবার কণ্ঠে কোনো জড়তা নেই, পা দুটোও কিছুমাত্র টলছে না।

এরই নাম বোধ হয় স্থান-মাহাত্ম্য।

ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে আলিহোসেনের গলায় ফাঁসটা ঠিকমত পরিয়ে দিয়ে মধু তার মুখস্থ বুলিটা আউড়ে গেল। "আমার কোনো অপরাধ নিও না ভাই। আমি হুকুমের দাস। হুকুম পালন করছি......।" তারপর হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে অপলক চোখ দুটো তুলে ধরল বড় সাহেবের দিকে। তিনি হাতের রুমাল খানা মাটিতে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতল টেনে দিল হ্যাংম্যান। লোহার পাতখানা সরে গেল এবং মুহূর্ত মধ্যে নিচেকার গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আলিহোসেনের দীর্ঘ দেহ। মোটা দড়িটা শুধু টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চোখের উপর। একটুখানি নড়ে উঠল একবার কি দুবার। তারপর একেবারে স্থির।

আমরা নির্ভাবনার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। শেষ পর্যন্ত সব ভালোয় ভালোয় উৎরে গেছে। অপারেশন সাকসেসফুল।

তারপর সারা বাংলার বিভিন্ন জেলে মধু ডোমের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। সেই একই চেহারা, একই পোশাক। সেদিনকার ব্যাপারটার জন্যে সে বরাবর মনে মনে লজ্জিত ছিল। একদিন বলেও ফেলেছিল—একটু গলা ভিজিয়ে নিতে হয় হুজুর। একটা জলজ্যান্ত খুন তো। পুরো জ্ঞান থাকলে করা যায় কখনো? তবে ঐ দিন ডোজটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই ফিরতে অত দেরি।

আর কোনদিন অবশ্য এতটুকু গাফিলতি দেখা যায়নি তার কথায়। কাজেও কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি।

ঐদিন যে তাকে আমি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছিলাম তার জন্যে সে মনে মনে আমার উপরে কৃতজ্ঞ ছিল। যত দেরিই করুক তবু ঠিক সময়ে এসে এবং ঠিকমত কার্যোদ্ধার করে দিয়ে সেও যে আমার মুখ রক্ষা করেছিল, তার জন্যে আমিও কম কৃতজ্ঞ ছিলাম না। দুয়ে মিলে আমাদের মধ্যে কেমন এক ধরনের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। কোনো জেল থেকে ডাক এলে গিয়ে যদি শুনত আমি সেখানে আছি সকলের আগে আমার সঙ্গে দেখা করত—"সব খবর ভালো তো হুজুর? মা, খোকাবাবুরা কেমন আছেন?"

আমিও তার ঘর সংসারের খবর নিতাম।

কালক্রমে আমি যখন কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেছি এবং রুমাল ফেলে দিয়ে শেষ ইঙ্গিত দেবার অধিকার লাভ করেছি তখনো আমাদের সম্পর্কটা বিশেষ বদলায়নি।

তারপর একদিন সরকারী চাকরির উচ্চ মঞ্চ থেকে নেমে এলাম। ফাঁসি মঞ্চ পড়ে রইল পিছনে। সে রাজ্যের প্রধান পুরুষ হ্যাংম্যানের সঙ্গেও আর কোনো সম্পর্ক রইল না। মাঝে মাঝে মধু দাসের কথা (ডোম বললে সে স্পষ্টতঃ ক্ষুন্ন হত) মনে পড়ত। ধীরে ধীরে ভুলে গেলাম।

বছর কয়েক আগে একদিন কালীঘাটের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম

ট্রামের আশায়। সেই পরিচিত স্বর—"সেলাম হুজুর।" চমকে উঠলাম। অনেক দিন বাদে শুনছি বলে নয়, লোকটার দিকে তাকিয়ে। লম্বা দেহটা যেন ভেঙে পড়েছে, চোখ দুটো কোটরে, চোয়ালের হাড় ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। বললাম, "কেমন আছ মধু?"

"আর কেমন!"

"কোনো অসুখ বিসুখ করেছিল নাকি?"

"না হুজুর, স্রেফ না খেয়ে না খেয়ে এই চেহারা। ছেলেপিলে-গুলোকে যদি দেখেন, চমকে উঠবেন।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেদিন আর নেই স্যর। কোনো জেল থেকেই আর ডাক আসে না।"

"অন্য লোক ঠিক হয়েছে বুঝি?"

"অন্য লোক!" যেন গর্জে উঠল, "মধুদাস ছাড়া হ্যাংম্যান আছে নাকি বাংলা দেশে? ফাঁসিই হয় না। আগেকার কালের সেই সব ছোকরা হাকিম তো আর নেই। তাদের বুকের পাটাই ছিল আলাদা। খুন প্রমাণ হলেই ফাঁসি। এখনকার এই বুড়ো জজবাবুদের সে সাহসই নেই। ফাসির হুকুম দিতে হাত কাঁপে। বসিয়ে দেয় 'যাবজ্জীবন'।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আই. সি. এস. জজদের আমলে যত ফাঁসি হত, পরের যুগে তা অনেক কমে গেছে।

মধু যেন একটু লজ্জিত হল—"আপনি হয়তো ভাবছেন দলে দলে লোক ফাঁসি কাঠে মরুক এই চাইছি আমি। তা নয়। কিন্তু দুটো-চারটেও যদি না মরে, ছেলেপিলে নিয়ে আমি বাঁচি কি করে?"

"অন্য কোন কাজটাজ—"

"কী কাজ করবো বলুন। আমার বৌও এই কথা বলে—শূয়োর চরাও, লাশ কাটো, নর্দমা সাফ করো। আমার জাতের অন্য পাঁচটা লোক যা করে। শুনুন কথা! আরে, আমি যে একটা হ্যাংম্যান। বত্রিশ টাকা সরকারী ফী পাই। আপনাদের মত সাহেব-সুবোরা ভালবাসেন। আমি কখনো ছোট কাজ করতে পারি?"

ট্রাম এসে পড়েছিল। উঠে পড়লাম। প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে ফুটপাত ধরে এগিয়ে গেল মধুদাস।

কয়েক মাস পরে আবার দেখা হয়ে গেল মধুর সঙ্গে। না হলেই বোধ হয় ছিল ভাল।

একটা সাহিত্য সভায় নিমন্ত্রণ ছিল। হাজরা রোডে ট্রাফিক জ্যাম, এগোবার উপায় নেই। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে ড্রাইভার কালীঘাটের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কয়েক মিনিট চলার পর দেখা গেল সেখানকার অবস্থা আরো জটিল। ঠিক সামনেই সারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিসের গাড়ি। পিছনে হটবার জো নেই; পর পর অনেকগুলো গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিসের আবির্ভাব স্বভাবতঃই আমার ড্রাইভারের কৌতূহল উদ্রেক করল। নেমে গেল খবর নিতে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে বলল, খুন কেস্। একটা মেয়ে মানুষের মাথা ফেটে গেছে। মেরেছে নাকি তার স্বামী। নাম শুনলাম মধু ডোম।

মধু ডোম! তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। পুলিস তখন লোক-জনদের জিজ্ঞাসা-বাদ করছে। খোলার ঘরের বারান্দার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা কঙ্কালসার নারীদেহ। মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কাছেই পড়ে আছে একখণ্ড রক্তমাখা কাঠ। ঘটনাটা মোটামুটি শোনা গেল।

মধু বড় একটা বাড়ি থাকে না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। দুপুরের দিকে ফিরছিল। সামনেই একটা দশ বারো বছরের উলঙ্গ ছেলে ম্যানহোলের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়াল। সর্বাঙ্গে ময়লা। প্রথমটা চিনতে পারে নি মধু। তারপর একটু ঠাহর করে দেখল, তার ছেলে। তেড়ে উঠল, একাজ করতে কে বলেছে তোকে?

"মা।"

"মা! চল, বাড়ি চল। ম্যানহোলে ঢুকতে লজ্জা করে না?"

ছেলে গ্রাহ্য করল না। বাকী লোকগুলোর সঙ্গে ওদিকটায় চলে গেল।

হন্ হন্ করে বাড়ি ফিরল মধুদাস। সামনেই পেল বৌকে। শাসিয়ে উঠল, "কার হুকুমে আমার ছেলেকে ঐ নোংরা কাজ করতে পাঠিয়েছিস ?"

বৌও সমানে তেড়ে জবাব দিল, "পাঠিয়েছি, বেশ করেছি। তিনদিন হাঁড়ি চড়েনি, এদিকে—"

"তাই বলে হ্যাংম্যানের ছেলে নর্দমা সাফ্ করবে !"

"অ্যাংম্যান !" শ্লেষে বিদ্রূপে ফেটে পড়ল বৌ, "তোর অ্যাংম্যানের মাথায় মারি ঝাড়ু।"

"মুখ সামলে কথা কস" বলে একটু কুৎসিত গালাগালি যোগ করল শেষের দিকে।

বৌটারও মাথার ঠিক ছিল না। তেড়ে এল, এবং মুখ থেকে যা বেরোল তাও কম কুৎসিত নয়।

মধুর হাতের কাছে ছিল একটা কাঠ। তুলে নিতেই বৌও একটা কি ছুঁড়ে মারল ওর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কাঠটা তার মাথায় গিয়ে পড়ল। এক ঘায়েই খতম।

আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এসে দেখল, বৌয়ের রক্তাক্ত দেহটার দিকে শূন্য বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মধু ডোম। তারপর ধীরে ধীরে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পুলিস এসে বাড়িতেই পেয়ে গেল আসামীকে। রান্না ঘরের আড়া থেকে ঝুলছে।

জীবনে অনেক ফাঁসি দিয়েছে হ্যাংম্যান। শেষ ফাঁস পরিয়ে দিল নিজের গলায়। দামী ম্যানিলা রোপ আর কোথায় পাবে ? নট্-ফটের ঝঞ্ঝাটও ছিল না। বৌয়েরই একটা ছেড়া শাড়ি পাকিয়ে দড়ি বানিয়েছে এবং গলায় পরে ঝুলে পড়েছে।

জরুরী তদন্ত

সকাল থেকেই কাজের চাপ; একবিন্দু ফুরসত নেই। বেশির ভাগই অবশ্য কাজ নয়, অকাজ, যাকে বলা যেতে পারে গণতন্ত্রের অফ্‌শূট, তার বিশাল দেহ থেকে যথেচ্ছভাবে গজানো।

আগেকার দিনে পারত পক্ষে থানার কাছে কেউ ঘেঁষতনা। এখন কথায় কথায় থানায় গিয়ে হামলা করাই সাধারণ রীতি। কোথাও পান থেকে চুণ খসলে তার কৈফিয়ৎ দেবে পুলিশ, অর্থাৎ থানার দারোগা। আর সে কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার সকলের—রাম, শ্যাম, যদু মধু, যার নাম পীপল্‌ বা জনতা।

ও-সি অর্থাৎ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার যিনি, তাঁর কিঞ্চিৎ সুবিধা আছে। যখন তখন বেরিয়ে পড়তে পারেন। কেন, কোথায় কাউকে বলবার দরকার নেই। সেকেণ্ড অফিসারকে বেরোতে হলে কারণ দেখাতে হয়। সব সময়ে তা থাকেনা। কাজেই থানার ঝক্কি ঝঞ্ঝাট, বেশির ভাগ তাকেই পোহাতে হয়।

আগরপাড়া থানার সেকেণ্ড অফিসার অনিল দত্ত বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত এক পেয়ালা চা পানেরও সুযোগ পাননি। মিনিট কয়েকের জন্যে বাসায় গিয়ে সবে কাপটা তুলে নিয়েছেন একজন সিপাই ছুটতে ছুটতে গিয়ে খবর দিল, পুলিস-সাহেবের ফোন। তিনিও এলেন ছুটতে ছুটতে।

"গুড মর্ণিং স্যার"

"গুড মর্ণিং"

"একবার আসতে পারেন?"

"এখনি যাচ্ছি স্যার।"

জীপ নিয়ে বেরিয়েছেন ও-সি। অনিলবাবুকে বাস্‌-এ করে যেতে হল। ভাবতে ভাবতে চললেন. এই খাড়া তলবের মূলে আর

যা-ই থাক কোনো শুভসংবাদ নেই। এস্-পি'র কণ্ঠে যে গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে যেন কিঞ্চিৎ অসন্তোষের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। অসন্তোষের কারণ তো সর্বদাই লেগে আছে। উপরওয়ালার সন্তোষ সাধন কে কবে করতে পেরেছে?

একটা ব্যাপারই বিশেষ করে মনে হল অনিলবাবুর। মাস তিনেক আগের সেই ছিনতাই কেস্টা।

সন্ধ্যা হয়েছে, কিন্তু অন্ধকার হয়নি। থানা থেকে কয়েক গজ দূরে এক গলির মধ্যে এক ছোকরার হাত থেকে দামী ঘড়ি আর পকেট থেকে পার্স ছিনিয়ে নিয়ে সরে পড়ল একটা লোক—চোখে কালো চশমা, মুখে চাপ দাড়ি। ছোকরা চীৎকার করতে যাচ্ছিল, করল না। চলার ধরন দেখে চিনে ফেলল লোকটাকে। ও পাড়ায় বাড়ি। মস্ত বড় মস্তান একজন। চেঁচালে ঘড়ি ব্যাগের সঙ্গে প্রাণটাও যাবে। দাড়িটা নকল হলেও পকেটে যে ছোরা আছে সেটি আসল ষ্টিলের তৈরী।

থানায় এল পরদিন। সারারাত বসে ভেবেছে, আসবে কি আসবেনা। এজাহারে মস্তানের নামটা গোপন করে গেল, অনেক পীড়াপীড়ির পর চেহারার একটা আভাস দিল, তার থেকেই বুঝতে পারলেন অনিলবাবু। গোপনে জিজ্ঞেস করলেন, মাধা মিত্তির তো?

ছেলেটা এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু কেউ যেন না জানে আমি বলেছি।

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো বলতেই হবে। আমি না হয় ওকে সন্দেহক্রমে অ্যারেষ্ট করে চালান দিলাম। মাল যে পাওয়া যাবেনা ধরে রাখুন। কোর্টে যখন মামলা উঠবে তখন যদি আপনি ওকে দেখিয়ে না দেন, না বলেন, এই-ই ঘড়ি পার্স ছিনিয়ে নিয়েছে, ওতো বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে।"

"আর বললেই কি ওর জেল হয়ে যাবে?"

"হতে পারে।"

"তারপর? এবারে নিয়েছে ঘড়ি, টাকা, আর ফিরে এসে যে আমার বৌ ছিনিয়ে নেবে।"

দারোগা অনিল দত্ত চুপ করে গেলেন। নতুন বিয়ে করেছে বেচারা। তার অবস্থাটা বুঝলেন। আগেকার দিন হলে জোরালো গলায় ভরসা দিতেন, আমরা আছি কী করতে? মঘের মুলুক নাকি?

এখন আর তা পারেন না।

অ্যারেষ্ট করার কথাটা ছোকরার কাছে বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে জানেন আসলে সেটা প্রায় অসম্ভব। মাধা মিত্তিরের দলটি ছোট নয়। বেশ কিছু ফোর্স নিয়ে গেলেও বোমা, সোডার বোতল ইঁট-পাটকেলের বেড়া পেরিয়ে ওকে ধরা যাবে না। ধরা যদি বা যায় ওর পলিটিক্যাল দাদারা ধরে রাখতে দেবেন না। মাধা মিত্তির না হলে তাদের পার্টি চলে না। না ছাড়লে মন্ত্রী মহলে যাবার হুমকি দেবেন। কোথা দিয়ে কি বিপদ আসবে কে জানে? তার চেয়ে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

তাই বা বাঁচে কই? অনিল দত্তের অবস্থা অনেকটা কালনেমির মত। ওপারে রামে মারে, এপারে রাবণ। কিছু একটা করতে গেলেও ফ্যাসাদ, আর না করলে উপরওয়ালার তর্জন-গর্জন,—"কোনো কাজের নন আপনি। এরকম একটা সিম্পল কেস্-এর ইনভেস্টি-গেশনে এত সময় লাগে নাকি?"

যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই। এস. পি ঐ কেস্-এর কথাই তুললেন এবং বেশ কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত বলে বসলেন, আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি অনিলবাবু, আপনার কাজকর্ম যদি এই রকম চলতে থাকে আপনাকে অন্যত্র যেতে হবে, এবং সেটা তেমন ভালো ষ্টেশন নাও হতে পারে।

মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলেন অনিল দত্ত। পুলিশ অফিসে গিয়ে যা শুনলেন, একেবারে চক্ষুস্থির। অর্থাৎ বদলি প্রায় স্থির। হেডক্লার্ক গোপনে জানিয়ে দিলেন, "কাকদ্বীপের সুবল ব্যানার্জি খুব

ঘোরাফেরা করছে। এরই মধ্যে বার তিনেক দেখা করে গেছে সাহেবের সঙ্গে। ওরই জায়গায় আপনাকে দেবার কথা হচ্ছে।"

কাকদ্বীপ! সর্বনাশ! সে যে দ্বীপান্তরের নামান্তর।

দোকানে গিয়ে পর পর তিন কাপ গরম চা গলাধঃকরণ করলেন অনিল দত্ত, সেই সঙ্গে গোটা পাঁচেক সিগারেট। একটা কথাই ঘুরতে লাগল তার মাথার মধ্যে—"সুবল ব্যানার্জি খুব ঘোরাফেরা করছে।"

বেলা একটার কাছাকাছি সাহেব যখন লাঞ্চের জন্যে উঠতে যাবেন সুযোগ করে আরেকবার দেখা করতে গেলেন অনিলবাবু—একটা প্রেয়ার ছিল, স্যার।

"বলুন।"

"মাঝিহাটার শীতল চৌধুরী বলছিল," ঘাড়ের পিছনটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন অনিলবাবু, "এতবড় পুকুর কাটালাম, মাছ ছাড়লাম, তা বড় সাহেব তো একবার এদিকে পায়ের ধুলো দিলেন না। শুনেছি মাছ ধরার ওঁর ভীষণ সখ, পাকা হাত। একবারটি যদি আসেন দয়া করে—

সাহেব ফাইল দেখছিলেন, দেখতে লাগলেন। অনিলবাবু সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। মনে হল, কপালের কুঞ্চনগুলো একটু যেন মিলিয়ে গেল, একটু যেন মোলায়েম ছায়া পড়ল চোখের তারায়।

মরিয়া হয়েই মনিবের এই দুর্বল স্থানটিতে হাত দিয়েছিলেন অনিলবাবু। একটা শেষ চান্স নেওয়া। কে জানে ওঁর হাতের ঐ ছিপের হুইল হয়তো তার ভাগ্যের হুইলটাকেও ঘুরিয়ে দিতে পারে।

"বড় মাছ আছে?" বেশ কিছুক্ষণ পরে জানতে চাইলেন সাহেব।

"খুব বড় না হলেও দশ পনর সেরী রুই প্রচুর। মাঝে মাঝে ওরা ধরে তো। ছিপ-টিপ ধারে কাছেও আসতে দেয়না।

"আচ্ছা, একটা রবিবার দেখে ব্যবস্থা করুন। তবে খাওয়া-

দাওয়ার কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট্ যেন না রাখে। লাঞ্চ্ আমার সঙ্গে থাকবে।"

আলিপুর থেকে অনিলবাবু সোজা চলে গেলেন মাঝিহাটা। শীতল চৌধুরী লোকটার নামের সঙ্গে প্রকৃতির কোনো মিল নেই। গরম হয়েই আছে। কারো খাতির করেনা। পুলিশ সাহেব তার পুকুরে মাছ ধরতে চান শুনে খুশী হওয়া দূরে থাক, সোজা 'না' বলে বসতে পারে। বড় জোতদার, প্রচুর ধান পায়। গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তার একমাত্র সম্পর্ক ঠিক মত লেভি মিটিয়ে দেওয়া। তা সে দেয়। চাষীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। পুলিসের তোয়াক্কা না রাখলেও চলে।

অনিল দত্তের কপাল ভালো। শীতলের মাথাটা সেদিন যে কারণেই হোক শীতল ছিল। কিছুটা খোসামোদ করতেই রাজী হয়ে গেল। একবার জানতে চাইল, আপনাদের সায়েবের কোন রাশি?

"তা তো জানি না। সিংহ-টিংহ হবে বোধ হয়। যে রকম হুঙ্কার দেয় মাঝে মাঝে।"

"মেছো রাশি না হলেই ভালো! হাত কী রকম?"

"কিচ্ছু না। একটা বাচ্চা পোনাও ধরতে পেরেছে বলে শুনি নি। শুধু সখ।"

অনিলবাবু যখন উঠে পড়েছেন, শীতল বলল, হ্যাঁ, দেখুন, ঐ চার-টারের ব্যবস্থা আমিই করবো। ওগুলো আর ওঁকে অতদূর থেকে টেনে আনতে হবে না। জিনিসটা ভাল দেখায় না।

অনিলবাবু খুশী হলেন, "তাহলে তো ভালোই হয়।"

শুভস্য শীঘ্রম্। পরের রবিবারেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। অনিলবাবু সঙ্গে গেলেন না। সাহেব সেটা পছন্দ করেন না। দলবল নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছি অন্যের পুকুরে—এতটা পাব্লিসিটি তাঁর ইচ্ছা নয়। আরদালী মোহন সিং ছাড়া আর কাউকে নিলেন না।

সোমবার ফার্স্ট্ অফিসে অর্থাৎ সাড়ে দশটা নাগাদ গিয়ে

পড়বার ইচ্ছা ছিল অনিলবাবুর। কী হল ওখানে, কি রকম মাছ-টাছ পেলেন মনিব, খুশী মনে ফিরেছেন কিনা, এসব খবর নেওয়া দরকার। তাছাড়া, শীতলটাকে বিশ্বাস নেই। কোনো বিভ্রাট বাধিয়ে বসেছে কিনা কে জানে? ঐ জন্যেই ছিল বেশী ভাবনা।

থানার ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে যেতে যেতে বেজে গেল বারোটা। সাহেবের ঘরের সামনেই কোতোয়ালী ও-সির সঙ্গে দেখা। গম্ভীর মুখ করে বেরোচ্ছেন।

"ব্যাপার কী দাদা?" জানতে চাইলেন অনিলবাবু।

"সুবিধের নয়। টেম্পার রীতিমত হট্। কোনো কথা বলতে দিচ্ছেনা। কাল শুনছি স্টেশনে ছিলনা। কোথায় কী ঘটল কে জানে?"

অনিলবাবুর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। ফিরে গেলেন আফিসে। সেখানেও শুনলেন এই নিয়েই আলোচনা চলছে। হঠাৎ কী হল কত্তার! নিশ্চয়ই বড় রকমের কিছু একটা ঘটেছে। পরশুও তো এরকমটা ছিলেন না।

মৎস-অভিযানের খবর অনিলবাবু ছাড়া আর কেউ জানেনা। সবাই যখন এই আকস্মিক বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে গবেষণা করছে, তিনি-সোজা চলে গেলেন মোহন সিং-এর কাছে। হ্যাঁ, যা সন্দেহ করেছিলেন, তাই। একটা মাছও পাননি সাহেব। ফাৎনা একেবারে নট নড়ন চড়ন। ঠায় বসে সারাদিন। রোদ্দুর ভোগই সার। এতে কার না মেজাজ বিগড়ায়? তবে শীতল কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। দু-তিন বার এসেছে মাঁচার ধারে, সাহেবকে তার বাড়িতেও একবার নিয়ে যেতে চেয়েছে। উনি অবশ্য যাননি। তাছাড়া সাহেব যে শূন্য হাতে ফিরে যাচ্ছেন, মাছ দূরে থাক, মাছের একটা ঠোকর পর্যন্ত দেখতে পেলেন না, সেজন্যে বারবার দুঃখ জানাতেও কসুর করেনি। সেটাই আরো বেশী লেগেছে সাহেবের। সময় বিশেষে সহানুভূতিরও একটা জ্বালা আছে এবং সেটা আঘাতের চেয়ে বেশী বাজে।

শুনে অনিল দত্ত একেবারে থ। এযে একেবারে অসম্ভব কাণ্ড! অত মাছ পুকুরে আছে, সাহেবের মত পাকা শিকারী। জানতে চাইলেন চার টার ফেলেছিল তো?

মোহন সিং বলল, ফেলেছে তো বললে। তাছাড়া আমরাও কিছুটা নিয়ে গিয়েছিলাম। তাও ছড়ানো হল। কিন্তু মাছের নাম গন্ধও নেই।

অনিলবাবু আর সাহেবের আফিসে গেলেন না। ওখান থেকেই ফিরলেন।

পরদিন ঐ বারোটা নাগাদ আবার গিয়ে উপস্থিত এস্ পির কামরার সামনে। সাধারণতঃ কাটা দরজাটা একটু ফাঁক করে মে আই কাম্ ইন, স্যর? বলে ঢুকে পড়েন। আজ আর সে সাহস হলনা। একটা শ্লিপ পাঠালেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ডাক পড়ল। স্যালুট দিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এস্ পি ফিরেও তাকালেন না। মিনিট দুই পরে বললেন, কী চাই আপনার?

প্রতিটি শব্দে রীতিমত ঝাঁজ।

"ইনভেস্টিগেশানটা সেরে এলাম স্যর। জরুরী কেস, ভাবলাম রিপোর্ট-টা এখনই দিয়ে যাই।"

"ঘড়িটা ট্রেস করতে পেরেছেন?"

"আজ্ঞে ঘড়ির কেস্ নয়। সেটাও কদিনের মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলবো। এ হচ্ছে শীতল চৌধুরীর ব্যাপার।"

"শীতল চৌধুরী!"—এবারে চোখ তুললেন সাহেব।

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর। এই দেখুন।

টেবিলের উপর রাখলেন এক বোতল জল। "কী ওটা?" কপাল কুঁচকে বিরক্তির সুরে বললেন এস্ পি। "কাইণ্ড্লি একবার শুঁকে দেখুন স্যর"—বলে অনিল দত্ত সিপিটা খুলে দিলেন। সাহেব হাত বাড়িয়ে বোতলটা নাকের কাছে নিয়ে বললেন, চারের গন্ধ মনে হচ্ছে।

"এখনো কি রকম ভুরভুর করছে দেখুন স্যর। কাল সন্ধ্যাবেলা

কালেক্ট করেছি। তার মানে কত ঝুড়ি ঢেলেছে বুঝুন। সব ওপারটায়, আপনি যেখানে বসে ছিলেন তার উল্টো দিকে, অনেকটা দূরে। আপনার মাচার সামনে দু চার চামচে ছিটিয়ে দিয়েছে। ব্যাটা কত বড় ধড়িবাজ! জানে অত অঢেল খাবার ফেলে একটা মাছও এপারে শুকনো বড়শী গিলতে আসবে না।"

এস্ পি কোনো কথা বললেন না। তাঁর মনে পড়ল ওপারে বেশ কিছু মাছের আন্দোলন লক্ষ করেছিলেন, বটে। অথচ এপারে কোনো সাড়া পাননি। ফাৎনাটা একবারও নড়েনি। ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। তেমনি বসে বসে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই রাগটা গিয়ে পড়েছিল তাঁর এই বাক-সর্বস্ব অফিসারটির উপর। এরই জন্যে তাঁর এই বিড়ম্বনা, ব্যর্থতা, সারাদিন রৌদ্র ভোগ করে খালি হাতে বাড়ি ফেরা।

এস্ পি চুপ করে আছেন দেখে অনিল দত্ত আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, "রীতিমত চিটিং কেস্ স্যর! ফোর-টুয়েনটির চার্জে বাছাধনকে কোর্টে টেনে আনা যায়। আগেকার আমল হলে অ্যারেস্ট করা যেত। এখন যা দিনকাল। অতটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তবে মামলা একটা—"

"আচ্ছা, আপনি এখন আসুন।"

কথার মাঝখানেই দাঁড়ি টেনে দিলেন এস্ পি। অনিলবাবু একটু নিরাশ হলেন। বুঝলেন, খুব একটা সুবিধা হল না। রাগটা যেন রয়ে গেল। নিজের উপর থেকে ঘুরিয়ে শীতল চৌধুরীর উপর নিয়ে ফেলতে পারবেন, এই আশা নিয়ে এসেছিলেন। তার তো বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বুটে বুট ঠুকে স্যালুট দিয়ে অ্যাবাউট্ টার্ন করে বেরিয়ে এলেন। দারুণ ছোটাছুটি গেছে এই কটা দিন। কোথায় মাঝিহাটা, কোথায় আগরপাড়া আর কোথায় আলিপুর, নাইবার খাবার অবসর পাননি। সব একেবারে নিষ্ফল। ব্যর্থতার অবসাদে, ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙ্গে পড়তে চাইছে।

ফেরার পথে আরেকবার ঢুঁ মারলেন হেড ক্লার্কের আঁফিসে। সেখানেও মুখভারের পালা। অন্য দিন বসতে বলে ভদ্রলোক, হেসে কথা কয়। আজ মুখও তুলল না। অনিলবাবু নিজে থেকেই বললেন, কোনো খবর আছে নাকি দাদা ?

"খবর বিশেষ ভালো নয়। ঐ কাকদ্বীপই বোধহয় টানছে আপনাকে।"

"বলেন কি !"

"অর্ডার এখনো হয়নি। ফাইল সাহেবের কাছেই আছে। কাল কোয়েরী করছিলেন, আগরপাড়ায় কদিন হল আপনার। তা বছর দেড়েকের ওপর হবে, কী বলেন ?"

"তার চেয়েও তো কত বেশী দিন থাকে কেউ কেউ।"

"তা থাকে বৈ কি ? অনেকে আবার ছ' মাসও থাকে না। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।"

অনিল দত্ত অনেকটা স্বগতোক্তির মত বললেন, বছরের মাঝখানে ট্রান্সফার ! চারটা ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পড়ছে। এদিকে গিন্নীর আবার ছ' সাত মাস।

উঠতে যাবেন এমন সময় কতগুলো ফাইল হাতে ঢুকল বড় সাহেবের চাপরাশী। কে জানে এরই কোনো একটা হয়তো তার ভাগ্য নিয়ন্তা। একটু বসে গেলেন। হেড ক্লার্ক ধীরে সুস্থে হাতের কাজ সেরে ফাইলগুলো খুলতে শুরু করলেন। গোটা দুই পড়ে বেঁধে সরিয়ে রাখলেন। তৃতীয়টা খুলেই খুশির সুরে বলে উঠলেন, না, এবারকার মত আপনার ফাঁড়া কাটল দেখছি। সুবল বাড়ুয্যে যাচ্ছে বারুইপুর, সেখান থেকে কানন গুপ্ত চলল কাকদ্বীপ।... কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।

"যেদিন আপনার ফুরসত হবে দাদা।"

কথাটা আমি নরেশের সামনে বলিনি, মনে মনে বলেছিলাম।

অনেককাল তো জেল নিয়ে কাটিয়ে দিলাম। খুনের অভিযোগ নিয়ে যারা এখানে এসেছে, তারপর রয়ে গেছে নানা রকম দণ্ড নিয়ে—কেউ দশ বছর কেউ বিশ বছর—আর যারা মাসকয়েকের বেশী থাকতে পারেনি, একদিন রাত্রিশেষে সাড়ম্বরে ফাঁসিমঞ্চে উঠে পরপারে চলে গেছে, তাদের বহুজনকে বহুভাবে জিজ্ঞাসা করেছি, খুন করেছিলে? একই উত্তর পেয়েছি প্রতিজনের মুখ থেকে—"না।"

—শাস্তি কেন হল?

তার উত্তর নানাজনে নানাভাবে দিয়েছে। কেউ বলেছে জ্ঞাতিবিরোধ, কেউ বলেছে পুলিশের কারসাজি, কেউ উকিল, সাক্ষী কিংবা হাকিমের মুণ্ডপাত করেছে, কেউ আবার কিছুই বলেনি, ডান-হাতের তর্জনি দিয়ে নিজের কপালটাকে দেখিয়ে দিয়েছে।

ফাঁসির জন্যে অপেক্ষমান দু-তিন জন বরং তাদের অন্ধকার সেল্-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে বলে গেছে, হ্যাঁ খুন করেছি। কেউ অনুতপ্ত কণ্ঠে, কেউ সগর্বে।

একজন আবার মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মোটা ম্যানিলা দড়িটা গলায় পরে মুখ ঢাকা টুপিটার আড়াল থেকে স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছে—খুন আমি করিনি, করছ তোমরা, একজন নিরপরাধ লোককে ঝুলিয়ে দিচ্ছ ফাঁসিকাঠে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি এর বিচার করবেন।

এই প্রথম একজন দায়মলি (যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত) আমার কাছে স্বীকার করল, সে খুন করেছিল। (না, আরেকজন করেছিল, একটি পনের ষোল বছরের ছেলে। তার কথা অন্যত্র

বলেছি। সে অপরিণত কিশোর। তাকে সাধারণের দলে ফেলা চলেনা। তাছাড়া, তার মন তখন বিক্ষুব্ধ, বিচলিত। কী বলেছিল, হয়তো নিজেই জানত না)।

নরেশ জানা তা নয়। সহজ, সুস্থমন, পরিণত-বুদ্ধি যুবক। অন্য দশজনের মত স্বাভাবিক মানুষ। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ নয়। আমার কাছে যখন এসেছিল সেদিন, কোন উত্তেজনার কারণ ঘটেনি। শান্ত বিনীতভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে আবেদন নিয়ে এসেছিল, পেশ করবার আগেই আমি তা জানতাম। তাই আসতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ডিউ হতে কদ্দিন বাকী ?

পাঁচদিন, স্যর।

ডেপুটিবাবুকে বল দিয়ে দিতে। আচ্ছা, দাঁড়াও আমি বলছি।

ব্যাপারটা হল, নরেশ দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী, বাইরে থেকে মাসে একখানা চিঠি পেতে পারে। অর্থাৎ গত মাসের পাঁচ তারিখে যদি তাকে কোন চিঠি দেওয়া হয়ে থাকে, এ মাসের চার তারিখের আগে পরের চিঠিটা পাবেনা। এর ভিতরে তার যে-সব চিঠি আসবে, অফিসে জমা থাকবে। আর যদি সে ইন্টারভিউ না নেয়, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে বাইরের কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করে, তাহলে ঐ একমাসের ব্যবধান কমে পনর দিন হয়ে যাবে।

নরেশের ইন্টারভিউ নেই, তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনা। কাজেই সে চিঠি পায় পনর দিন অন্তর। তার মধ্যেই অনেক সময় তার দুখানা তিনখানা চিঠি এসে জমা হয় অফিসে। সে খবর যখন তার কাছে পৌঁছায়, (নানাভাবে পৌঁছতে পারে) সে আমার কাছে মাথা নীচু করে এসে দাঁড়ায়। প্রয়োজন বোধ করলে স্পেশাল অর্থাৎ পাওনার অতিরিক্ত চিঠি মঞ্জুর করবার ক্ষমতা আমার হাতে ন্যস্ত আছে এবং কোন বিশেষ কারণে তার বেলায় সে প্রয়োজন আমি বোধ করে থাকি। আমার নির্দেশমত চিঠিপত্র সেরেস্তার ডেপুটি জেলার সেই চিঠির উপরে লেখেন Allowed as a special case. আমি তার নীচে সই করি। নরেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে

ওঠে। চিঠিখানা সার্টের পকেটে ফেলে আমাকে একটা নমস্কার করে দ্রুতবেগে চলে যায়।

উল্লেখ করা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন, এই চিঠিগুলো যার কাছ থেকে আসে, সে একটি মেয়ে।

নরেশকে দিয়েই ডেপুটি জেলার বাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, এমনিতেই পাওনা হয়ে যেত, স্পেশাল কেস্ করবার দরকার হতনা। কিন্তু সেদিন একটা ইণ্টারভিউ হয়ে গেল কিনা।

"ইণ্টারভিউ !" আমার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, স্যর, মা এসেছিল", চোখ না তুলেই বলল নরেশ, "দাদারা অবিশ্যি জানে না। জানলে আসতে দিতনা !"

আমরা চুপ করে রইলাম। নরেশ বলল, ভাবছি, দেখা না করলেই বোধহয় ভাল হত। যদি জানাজানি হয়ে যায় খুনী ছেলেকে দেখতে এসেছিল মা, হয়তো বাড়িতে আর জায়গা হবে না।

ডেপুটিবাবু চিঠিটা ওকে দেবার ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন। সেই ফাঁকে বললাম, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো করবো করে করিনি। অবিশ্যি তোমার যদি বলতে আপত্তি থাকে—

নরেশ বলে উঠল, জিজ্ঞেস করুন স্যর। আপনাকে বলতে পারি না, এমন কোনো কথাই আমার নেই।

তখনো একটু ইতস্ততঃ করছি দেখে বলল, বুঝেছি, আপনি কি জানতে চান। হ্যাঁ, খুন আমি করেছি। আমার এক বন্ধুকে; ছেলেবেলা থেকে আমরা এক পাড়ায় এক সঙ্গে মানুষ, দুজনে দুজনকে ভালবাসি। অবিশ্যি, খুন করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। চেয়েছিলাম শুধু তার চোখ দুটো শেষ করে দিতে। সে নিজেই শেষ হয়ে গেল।

বলতে বলতে মনে হল, একটু যেন উসখুস করছে। কারণটা বুঝতে পারলাম। চিঠিটা এখনো পায়নি, ওদিকে ডেপুটি বাবু এতক্ষণে সব কিছু রেডি করে রেখেছেন। বললাম, আচ্ছা, আজ তুমি যাও। পরে আরেক দিন শোনা যাবে সব কথা।

দিন কয়েক যেতেই শুনলাম তার খুনের ইতিহাস।

ঠিক কোলকাতায় নয়, সহরতলীর কোথায় ওরা থাকত। নরেশ জানা আর হরেন বিশ্বাস। বয়স খুব কাছাকাছি, বাড়িও প্রায় পাশাপাশি। এক সঙ্গেই বেড়ে উঠেছিল। নরেশ লেখাপড়ায় ভাল, ফি বছর পাশ করে ক্লাসে ওঠে, তবে স্বাস্থ্যটা নরম, যাকে বলে ডেলিকেট, হরেন শক্ত মজবুত ডানপিটে, কিন্তু লেখাপড়ায় মন নেই। তার ঝোঁক শরীরচর্চায়। গঙ্গা বেশী দূর নয় বাড়ি থেকে। সেখানে সাঁতার কাটে, স্কুলের পরে কোথায় যেন ব্যায়াম শিখতে যায়, ডন, বৈঠক, ডাম্বেল, প্যারালাল বার, ভার তোলা, এই স।।

নরেশ বি. এ. পাশ করে গেল এবং কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে এক সওদাগরি আফিসে ঢুকে পড়ল। হরেন স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারে নি, কাজ পেল কাছাকাছি একটা কারখানায় লেদ-মেশিনে। হাড়ভাঙ্গা খাটনি, সামান্য মাইনে। তার থেকে দাদার সংসারে কিছু দিতে হয়, বাকি যা থাকে তা দিয়ে পেস্তা বাদাম দূরে থাক, ছোলা ভেজা আদার কুচিও জোটে না।

নরেশের অবস্থাও এমন কিছু সচ্ছল নয়, কিন্তু নিজের চেয়ে 'হরেনটার' জন্যেই তার বেশী ভাবনা। একদিন এক মতলব এল মাথায়।

আফিসে যেতে আসতে দেখত, একপাল উঠতি বয়সী ছোকরা কোনো একটা বাড়ির রোয়াকে বসে আড্ডা দেয়, বিড়ি টানে, মেয়েরা যখন স্কুলে যায়, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে, এমন দু-চারটা মন্তব্য ছুঁড়ে মারে, যা শ্রাব্য নয়। ছেলেগুলো প্রায় সবই নরেশের চেনা। কেউ কেউ স্কুলে যায়, বেশির ভাগই ওপাট চুকিয়ে বসে আছে, করবার কিছু নেই। যার বাড়ি,—একজন বুড়ো ভদ্রলোক, এক সময়ে চাকরি-বাকরি করতেন, রিটায়ার করে ঐ বাড়িটা করেছেন—ছেলেগুলোর উপর স্বভাবতই খুব বিরক্ত, কিন্তু ওদের ঘাঁটাতে সাহস করেন না। পাড়ার মধ্যে তাঁর আরেক খণ্ড জমি আছে। ছেলে-বেলায় নরেশরা সেখানে খেলাধুলো করত, এখনো খালি।

নরেশ একদিন দেখা করল ভদ্রলোকের সঙ্গে এবং প্রস্তাব দিল, ঐ জমিটুকু যদি তিনি দেন, নরেশ এ পাড়ায় ও পাড়ায় ঘুরে কিছু চাঁদা আদায় করে ওখানে একটা ছোটখাটো জিমন্যাসিয়াম বা ব্যায়ামাগার গড়ে তুলবার চেষ্টা করবে। উদ্দেশ্য পাড়ার ঐ বখাটে নিষ্কর্মা ছেলেগুলোকে ওখানে নিয়ে ভেড়ানো। ও-সব নিয়ে থাকলে হয়তো মতিগতিটা কিছু ফিরতে পারে। অন্ততঃ পুরোপুরি বয়ে যাবে না।

ভদ্রলোক রাজী হয়ে গেলেন। দান নয়, আপাততঃ কিছু নেবেন না, পরে জিমন্যাসিয়াম যদি দাঁড়িয়ে যায়, তখন একটা ভাড়া ঠিক করতে হবে।

চাঁদা কিছু কিছু উঠতে লাগল। নরেশের একটা সুনাম ছিল পাড়ায়, হরেনের পেশীবহুল দেহ এবং ব্যায়াম-নিষ্ঠা অনেকে প্রশংসার চোখে দেখত। ছেলে জুটতে দেরি হল না। নাম-মাত্র ফী, অবস্থা বুঝে তাও সকলকে দিতে হয় না।

এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিলেন ও-পাড়ার ভবানীবাবু। মোটামুটি ভাল চাকরি করেন। থাকেন বেশ স্টাইলে। নিজের বাড়ি। দুটি মেয়ে একটি ছেলে। বড় মেয়েটির নাম শর্বরী। তাকে দেখা যায়, এবেলা ওবেলা পোষাক বদলাচ্ছে। বাবার সবচেয়ে আদুরে সন্তান। নরেশ তাকে চিনত।

সেই পরিচয়েই দেখা করল তার বাবার সঙ্গে। তিনি খুব খুশী হলেন ওদের নতুন প্রচেষ্টার কথা শুনে। এককালীন কিছু ডোনেশন এবং মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

জিমন্যাসিয়াম চালু হল। হরেনও বিপুল উৎসাহে কাজে লেগে গেল। ট্রেনিং-এর দিকটা তার, নরেশের হাতে রইল আর্থিক ও অন্যান্য ব্যাপার।

ভবানীবাবু মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতেন। একদিন শোনা গেল, তিনি হঠাৎ মারা গেছেন। কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। চারদিকে দেনা, বাড়িটা পর্যন্ত বাঁধা।

শর্বরী সবে কলেজে ঢুকেছে। ভাই বোন দুটি স্কুলে। তার মা বরাবরই অতি শান্ত, নিরীহ, ভালমানুষ, এতদিন কর্তা ছিলেন, কিছু বুঝতে পারেন নি। এবার চোখে অন্ধকার দেখলেন। মেয়েকে কলেজ ছেড়ে রোজগারের ধান্দায় নামতে হোল। কিন্তু চাকরি অত সহজ নয়। চেহারা ভালো, গান জানে। কার পরামর্শে সিনেমার দিকে ঝুঁকল শর্বরী। সেখানেও বিশেষ সুবিধা হল না। একমাত্র সম্বল কখনো কচিৎ সখের নাটকে দুটো একটা পার্ট। তাতে আর কি হয়?

শর্বরীর মুখ চোখ ভালো, লম্বা টম্বা আছে, গড়নও মন্দ নয়, কিন্তু শরীরটা একটু থলথলে, ইংরাজীতে বলে ফ্ল্যাবি, (flabby) আঁটসাঁট নয়, সিনেমা থিয়েটারে যেটা দরকার। ছেলেবেলা থেকে বেশী দুধ, ঘি, রাবড়ির জের হয়ত। ঐ ত্রুটিটুকু যদি না থাকত, সে অনায়াসে নায়িকার চান্স্ পেয়ে যেত। অন্তত শর্বরীর তাই ধারণা।

নরেশদের আখড়া ছিল খোলা জায়গায়। চারদিকে একটা চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু উপরে কোন আচ্ছাদন দিতে পারে নি। পাশে একটা টালির চালা ছিল, অফিসও বটে, বৃষ্টির সময় মাথা বাঁচাবার জায়গাও বটে।

রবিবার ব্যায়াম হত না। একদিন সকালের দিকে দু বন্ধুতে মিলে কথাবার্তা বলছিল। শর্বরী এসে হাজির তার বেঁটে ছাতাটি নিয়ে। ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পাশের পাড়ার মেয়ে হলেও, এমন একটি আধুনিকার ছাপ ছিল তার চেহারায় পোষাকে এবং আদব কায়দায়, যাতে ওরা ঠিক অভ্যস্ত নয়। বসতে বলতেই ভুলে গেল এবং নিজেরাও দাঁড়িয়ে রইল। ফালতু চেয়ার ছিল একখানা। শর্বরী নিজেই সেটি দখল করে ওদের বসতে বলল এবং কোনো রকম ভূমিকা না করে বলল, আচ্ছা, আপনারা একটা মেয়েদের সেক্‌শন্ খোলেন না কেন?

মেয়েদের! আকাশ থেকে পড়ল দুই বন্ধু।

মেয়েদেরও ত ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের দরকার আছে। শরীর ভালো থাকে, গড়ন ভাল হয়।

সে তো নিশ্চয়ই। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল নরেশ, কিন্তু আমাদের এখানে সে ব্যবস্থা নেই।

ব্যবস্থা করলেই হয়। সন্ধ্যার পর ছেলেদের শিফট্ একটু পিছিয়ে দিয়ে একটা ব্যাচ মেয়ে নিতে পারেন।

সন্ধ্যার পর কি মেয়েদের এখানে আসবার সুবিধে হবে? বাড়ির লোকেরা হয়ত পাঠাতে আপত্তি করবেন।

তা হলে সকালে করুন।

আচ্ছা, আপনার প্রস্তাবটা আমরা ভেবে দেখবো।

হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করল শর্বরী। উঠে দাঁড়িয়ে বলল আচ্ছা, আপনারা ত এই লাইনে এক্সপার্ট। দেখুন তো একসারসাইজ করলে আমার কোন উপকার হবে কি না। মানে এই—

বলে, দেহের উর্দ্ধাংশ থেকে সাড়ির আঁচলটা নামিয়ে ফেলল। শুধু ব্লাউজ ঢাকা বাস্টএর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, আমি কি চাইছি বুঝতে পারছেন তো? ফালতু ফ্যাট ট্যাট্গুলো কমিয়ে ফেলতে। হবে?

তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে বলল, এ দিকটাও দেখুন।

ওরা কিছু বলল না। নরেশ একবার আড়চোখে তাকাল বন্ধুর দিকে। তাকিয়েই চমকে উঠল। দুটো নিষ্পলক ক্ষুধার্ত চোখ সামনের ঐ যৌবনপুষ্ট প্রায়-অসংবৃত দেহটাকে যেন গিলে খেতে চাইছে।

শর্বরী শাড়িটা ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার সেই চেয়ারটাতে বসে পড়ে বলল, ব্যাপার কি জানেন? আমি সিনেমায় নামতে চাই। চান্স পাচ্ছি না। ওরা বলছে আপনার ফিগার ভাল, কিন্তু আরো শ্লিম্ হতে হবে। কি করে শ্লিম হওয়া যায় বলুন তো? খাওয়া একদম কমিয়ে দিয়েছি। তাতে আবার দুর্বল বোধ করি। মাথা ঘোরে, একটু হাঁটা চলা করলে হাঁফ ধরে।

নরেশ বলল, দেখুন এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। তবে শুনেছি কোন কোন

জিমন্যাসিয়ামে মেয়েদের ব্যায়াম শেখাবার আলাদা বন্দোবস্ত আছে। চান তো খবর নিতে পারি।

—দূরে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। মার শরীর খারাপ। আমাকে কিছুটা সংসার দেখতে হয়। আপনাদের এটা একেবারে বাড়ির কাছে ছিল। তাই ভাবছিলাম—আচ্ছা নমস্কার।

শর্বরীকে যতক্ষণ দেখা গেল হরেন সেইদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে বলল, খাসা দেখতে হয়েছে মেয়েটা। মাইরি বলছি, এরকম একখানা ফিগার খুব কম চোখে পড়ে। সামান্য একটু ঝরে যাওয়া দরকার। তারপর যা দাঁড়াবে—

বাকীটা আর সম্পূর্ণ করল না। চোখ মুখের ভঙ্গি আর মুখে একটা শব্দ করে বুঝিয়ে দিল।

নরেশ কি একটা হিসাব দেখছিল, সাড়া দিল না। কিছুক্ষণ নিজের মনে যেন খানিকটা বোঝা পড়া করে নিয়ে হরেন আবার বলল ছাখ, কথাটা কিন্তু ও মন্দ বলে নি। মেয়েদের একটা ব্র্যাঞ্চ খুললে হয়। এদিকে আজকাল অনেকের ঝোঁক পড়েছে। ছেলেগুলো যেমন প্রায় সব শালা 'ফিরি', একটা পয়সা ছোঁয়াবার নাম নেই, আমাদেরই যেন কেতাত্থ করতে এসেছে, মেয়ে যদি নেওয়া যায় একেবারে শুকনো হবে না, ওরা কিছু কিছু দেবে।... বলি, শুনতে পাচ্ছিস, না অজ্ঞান হয়ে গেলি? সত্যি, যা একখানা দেখিয়ে গেল মাইরী...বলে, মুখে চকচক করে আচার খাবার মত আওয়াজ করল।

নরেশ খাতা থেকে মাথা তুলে বলল, একটা কথা বলবো?

কী, বল্ না।

ও সব মতলব ছাড়ো।

কী মতলব?

নরেশ সে কথার জবাব দিল না।

হঠাৎ একদিন নরেশের কানে এল, হরেন শর্বরীদের বাড়ী যাতায়াত করছে। শুনে একেবারে থ হয়ে গেল। তার সেই চোখ দুটোর কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করল, ওর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এটা বন্ধ করা। তাকে একবার জানায়নি পর্যন্ত রাস্কেলটা! লুকিয়ে গোপনে গিয়ে উঠেছে! পরক্ষণেই মনে হল, হরেন যদি তার কথা না শোনে? সে বন্ধু মাত্র, অভিভাবক নয়। সে বাধা দেবার কে? কিন্তু এ যুক্তি টিকল না। শর্বরীকে যেমন করে হোক ঐ বদমাসটার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

তোমার কিসের গরজ? শর্বরী তোমার কে?—নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছিল নরেশ জানা। স্পষ্ট উত্তর পায় নি। কিন্তু অন্তরের নিভৃতে শর্বরীর মুখখানা বারংবার উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। নিজের অজ্ঞাতে এই মেয়েটিকে ঘিরে কখন যে একটি রঙিন ছোপ লেগেছিল তার মনের কোণে, হঠাৎ আবিষ্কার করে চমকে উঠেছিল।

সেদিন দেখা হওয়ার পর থেকে সে অনেক ভেবেছে শর্বরীর জন্যে। সিনেমায় ঢুকলে নষ্ট হয়ে যাবে মেয়েটা। সেই অধঃপাতের পথেই ত পা দিয়েছে। তা না হলে নিজেকে অমন করে বে-আব্রু করে দেখাতে পারে দুজন যুবকের সামনে? না, তার মধ্যে কোন খারাপ ইঙ্গিত ছিল না। তাদের প্রলুব্ধ করবার কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করেনি। এ শুধু শালীনতার অভাব। অবস্থা বৈগুণ্যে যে পরিবেশে গিয়ে পড়েছে, যে সংসর্গে ঘোরাফেরা করছে, সিনেমায় নামবার যে উদগ্র আকাঙ্খা তাকে চঞ্চল করে তুলেছে—সব মিলে একটি ভদ্রঘরের মেয়ের সে সহজ সম্ভ্রমবোধ, তাকে টিকতে দিচ্ছেনা, আঘাতে আঘাতে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এখনো হয়তো বাঁচানো যায়।

জানা-শুনো যত জায়গা আছে, শর্বরীর জন্যে একটা ভদ্রগোছের চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা করে চলেছিল নরেশ। কোন রকম একটা সংস্থান। তাকে কিছুই জানায়নি। মনে মনে ভেবে রেখেছিল, খোঁজ পেলে তখন যাবে তার মায়ের কাছে। এমন সময়ে এল ঐ খবর, হরেনের গোপন অভিযান।

তারপর আরো খবর এল। ঐ পাড়ার একটি ছেলে আসত তাদের আখড়ায়। সে-ই নিয়ে এল। শর্বরীর মা নরেশকে একা ডেকে নিয়ে গোপনে জানাতে বলে দিয়েছেন, হরেন শর্বরীকে তাদের বাড়িতে গিয়ে ব্যায়াম শেখাচ্ছে, এটা তাঁর মোটেই ভালো লাগছে না। পাড়াতেও এই নিয়ে নানা রকম কানাঘুষা চলছে। মেয়েটা সে সব গ্রাহ্য করে না, বড্ড একগুঁয়ে, তিনি বড় ভয়ে ভয়ে আছেন। কী যে ব্যায়াম শেখার ভূত চেপেছে ওর মাথায়! কী হবে এসব দিয়ে?

আরো জানিয়েছেন হরেনকে তিনি মেয়ের অগোচরে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে আমল দেয়নি। বলেছে, যারা ঘোঁট পাকাচ্ছে একবার শুধু তাদের নামগুলো আমাকে জানিয়ে দেবেন। তারপর আমি দেখে নেবো।

শুনে আরো দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বিধবা ভদ্র মহিলা।

নরেশ মনস্থির করে ফেলল! হরেনকে সে সোজাসুজি নিষেধ করে দেবে। সহজে না শুনতে চায়, শোনাতে হবে যেমন করে হোক। এই এক্সারসাইজের ব্যাপারটা বন্ধ করতেই হবে। তার জন্যে তাদের এত দিনের সম্পর্ক যদি শেষ হয়ে যায় তো যাক।

ছেলেটি তাকে বলেছিল সকালবেলা। হরেন তখন ছিল না। তার মিলএ মর্ণিং ডিউটি চলছিল। সন্ধ্যা বেলা এলেই এর একটা হেস্ত নেস্ত করে ফেলতে হবে। ভিতরে ভিতরে নিজেকে সে তৈরি করে তুলল।

কিন্তু একটা জিনিষ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না নরেশ, শর্বরী হরেনটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কেন, সহ্য করছেই বা কেমন করে? একেবারে ছেলে মানুষ তো নয়। সে কি বুঝতে পারছে না তার এই ব্যায়াম শিক্ষকের (!) আসল মতলবটা কী? হঠাৎ তার মধ্যে এই পরোপকার-প্রবৃত্তি জেগে উঠল কেন? তবে কি বুঝে শুনেই গা ভাসিয়ে দিয়েছে? কী পেল ওই মিস্ত্রীটার মধ্যে? শিক্ষা সংস্কৃতি সুরুচির বালাই নেই, আছে একটা পেশী-বহুল দেহ।

ছেলে বেলা থেকে চর্চা করে করে শরীরটা যা বাগিয়েছে সত্যিই দেখবার মত। তাই দেখেই ভুলল শর্বরী? হয়তো তাই ভোলে মেয়েরা। তাদের চোখে পুরুষের রূপ তার বাহুতে। সুন্দর পুরুষ বলতে তারা বোঝে সবল পুরুষ।

অথবা এও হতে পারে, মেয়েটা বড় কাঁচা। দেহে যৌবন এসে গেছে, মন এখন পিছনে পড়ে আছে। বুঝতে শেখেনি কে কী চোখে দেখছে তার দিকে। হয়তো অতিরিক্ত সরল। তা না হলে আঁচলটা ফস করে খুলে ফেলতে পারে? ওর সঙ্গে একবার দেখা করলে হয় না? আর কিছু নয়, শুধু একটু সজাগ, সচেতন করে দেওয়া। একটু সাবধান হতে বলা—সবাইকে অতটা বিশ্বাস করতে নেই। মানুষ চিনে চলা দরকার।

সন্ধ্যার কিছু আগেই শর্বরীদের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল নরেশ। কড়া নাড়তেই শর্বরীর পরের যে ভাই সে এসে দরজা খুলল। নরেশ বলল, তোমার মাকে বল আমার নাম নরেশ জানা, মাঝের পাড়া থেকে আসছি। বলতে হল না। তার গলা মার কানে গিয়েছিল। তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন। অত্যন্ত বিচলিত বলে মনে হল তাঁকে। বললেন, তোমার কথাই ভাবছিলাম বাবা, ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন।

"কী হয়েছে?" উদ্বেগের স্বরে জিজ্ঞেস করল নরেশ।

—যা ভয় করেছিলাম, তাই। তোমাকে তো আগেই সব জানিয়েছি। তোমার ওই বন্ধুটির চোখের দৃষ্টি ভালো নয়, আমি প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। মেয়েটাকে তো পষ্ট করে বলা যায় না। তবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতটা পারা যায়, বলতে কিছু বাকী রাখিনি। ও শুনল না। তারপর—

হঠাৎ ওদিকের একটা ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল, বেরিয়ে এল শর্বরী। এক নজরে দেখেই নরেশ শিউরে উঠল।

একী! এতো প্রকৃতিস্থের চেহারা নয়!

একরাশ এলোচুল ফুলে উঠেছে, সারা কপালময় লেপটে গেছে

কুমকুমের টিপ, চোখের কাজল লেগেছে গালে, বেশবাস আলুথালু, দুচোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। মাথা দুলিয়ে ঠোঁটের কোনে এক অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, ও, এবার বুঝি আবার আপনি এসেছেন?

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে এবং তার মূলে রয়েছে হরেন, এটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না। কিন্তু কখন কোথায় কী করল সে, তার মোটামুটি বিবরণটা পাবার জন্যে নরেশ আবার শর্বরীর মায়ের দিকে তাকাল। তিনি যেখানে থেমে গিয়েছিলেন সেখান থেকে আবার শুরু করতে যাবেন, তার আগেই দু-পা এগিয়ে এসে তর্জনী তুলে চিৎকার করে উঠল শর্বরী, "কেন আপনি ওই জানোয়ারটাকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে এক্সারসাইজ করাবার জন্যে?"

"আমি পাঠিয়েছি!"—গভীর বিস্ময়ে কথাগুলো কোনরকমে আওড়ে গেল নরেশ, "তাই বুঝি বলেছে সে?"

উত্তর দিলেন বিধবা, হ্যাঁ, বাবা। তা না হলে আমরা তাকে ঢুকতে দিই? আমরা তোমাকে চিনি, তাকে তো চিনি না।

ওঁরও সড় আছে এর মধ্যে। এখন ন্যাকা সাজছেন।···তীব্র, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যোগ করল শর্বরী।

"বিশ্বাস করুন," আবেদনের সুরে বলল নরেশ, "আমি কিছুই জানতাম না। আজই শুধু জেনেছি, আপনি যে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলেন, তার কাছে।"

বলতে বলতে শর্বরীর মায়ের দিকে ফিরল। দৃঢ় স্বরে বলল, কিন্তু আমাকে যদি সব কথা খুলে বলেন, আমি অবশ্যই প্রতিকার করবো, বন্ধু বলে ছেড়ে দেবো না।

—আর কী প্রতীকার করবে তুমি? এসো, আমার ঘরে এসো। বলছি।

গোড়া থেকে হরেনের আচার আচারণের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিলেন মহিলাটি।

প্রথম কদিন একসারসাইজের ফিগারগুলো একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজে দেখিয়ে দিত। শর্বরী অনুকরণ করত। ঠিক না হলে কোথায়

কোন ত্রুটি হচ্ছে মুখে বলে এবং নিজের হাত পায়ের সাহায্যে বুঝিয়ে দিত। কাছে যায়নি, বা ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেনি। কদিন যেতেই একটু একটু করে এগুতে লাগল। তেমন অশোভন কিছু নয়। হাতটা পাটা, মাথা বা ঘাড়ের কাছটা ধরে ভুলগুলো শুধরে দেওয়া। মাঝে মাঝে যে সীমা ছাড়িয়ে যেত না, তা নয়। শর্বরী কৌশলে এবং ভদ্রভাবে যতটা সম্ভব বাধা দিত—ব্যস, ব্যস ; আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে দেখুন না, আমি ঠিক করছি।

এইদিন বিকালে এসে একটা নতুন 'একসারসাইজ' শেখাচ্ছিল। শুয়ে পড়ে একটা করে পা আস্তে আস্তে সোজা উপরে তোলা, আবার নামিয়ে আনা। এমন কিছু শক্ত নয়। গোড়ালির কাছে আঁটা চুড়িদার পায়জামা পরে নিয়েছিল শর্বরী। তাতেই প্রথম আপত্তি তুলল হরেন। বলল, এসব একসারসাইজ খাটো জাঙ্গিয়া কিংবা সাঁতারের পোষাক পরে করতে হয়। পায়ের মাসল্ দেখে বুঝতে হবে ঠিকমত হচ্ছে কি না।

শর্বরী সে কথায় কান দেয় নি। নিজে নিজেই করছিল। হরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ 'কিচ্ছু হচ্ছে না' বলে এগিয়ে গেল···

শর্বরীর চিৎকার শুনে তার মা যখন রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন, তখন সে চলে যাচ্ছে।

নরেশ নিঃশব্দে বসে শুনল। তারপর হঠাৎ ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। তার চোখ মুখের চেহারা দেখে ভদ্রমহিলা আবার একটা নতুন বিপদের আশঙ্কা করে থাকবেন। পিছন থেকে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলেন—এ নিয়ে তুমি কিছু করতে যেও না বাবা। কী লাভ হবে তাতে ? শুধু কেলেঙ্কারিটা বাড়বে বৈ তো নয়।

শর্বরী বোধহয় ততক্ষণে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। সেও ডাকল, শুনুন··· ।

নরেশ দূর থেকে শুনতে পেল, কিন্তু থামল না।

পরের ঘটনাগুলো আমার কাছে আর বিস্তারিতভাবে খুলে বলেনি নরেশ। শুধু সেই প্রথম উক্তির পুনরুক্তি করেছিল—তাকে মেরে ফেলবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না স্যর, শুধু সেই চোখ দুটো উপড়ে নিতে চেয়েছিলাম। হতভাগাটা মরে গেল।

আদালতে খুনই প্রমাণ হয়েছিল। স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের মধ্যে চিরকাল যা হয়ে আসছে, এও তাই—এ কথাটি প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে ছিলেন পাব্লিক প্রসিকিউটর। হাকিমও সেটা অবিশ্বাস করবার হেতু খুঁজে পান নি। তবে চরম দণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারা-ভোগের আদেশ দিয়েছিলেন।

জেল হবার কিছুদিন পরেই নরেশের প্রথম চিঠি যেখানা এল, সেটা শর্বরীর। তারপর ঘন ঘন আসতে লাগল। কী থাকত তার মধ্যে, আমি জানি না। নরেশ আমাকে বলে নি। তবে চিঠি এসেছে খবর পেলেই সে যেমন করে আমার কাছে ছুটে আসত এবং চিঠিখানা হাতে পেয়েই তার মুখখানা যে রকম উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, তার থেকে বুঝতে পারি, ওইগুলোই ছিল তার ধরে দাঁড়াবার অবলম্বন। জেলের বাইরেকার যত নিন্দা, ঘৃণা, অপমান অপযশ আর ভিতরকার দুঃখ কষ্ট গ্লানি, সব মুছে দিয়েছিল খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া রুলটানা কাগজের উপর কাঁচা হাতের কটি আঁচড়।

বছর দুই পরে চিঠির সংখ্যা কমে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নরেশ আর তখন আমার কাছে আসত না, আসত চিঠিপত্রের সেরেস্তায়। প্রায়ই খোঁজ নিত তার কোন চিঠি আছে কিনা।

(যাবজ্জীবন দণ্ডের পুরো মেয়াদ কুড়ি বছর। মাসে মাসে কিছুটা করে মকুব করেন জেল কর্তৃপক্ষ। সেগুলো জুড়ে যখন চোদ্দ বছর পূর্ণ হয়, সরকারের আদেশে প্রত্যেকেই ছাড়া পেয়ে যায়। অর্থাৎ

মোটের ওপর এগার-বার বছরের বেশী কাউকে বড় একটা থাকতে হয় না।) নরেশ ছাড়া পেল আরো অনেক আগে। স্বাধীনতা উপলক্ষে মোটা রকম রেমিশন অর্থাৎ মাপ পেয়েছিল কয়েদীরা।)

বেরোবার সময় এমনিই কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলাম, শর্বরীর কোন খবর পেয়েছ?

না স্যর। অনেক দিন চিঠি-পত্তর লেখেনি। নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে আছে। তবে—

বলে মাথা নীচু করে সলজ্জ মুখে বলল, সে আমাকে বার বার কথা দিয়েছে। আশা করছি শীগগিরই আমরা আপনার পায়ের ধূলো নিতে আসবো।

শীগগিরই এসেছিল। 'আমরা' নয়, সে একা।

আমার বাসায় এসে দেখা করেছিল। আসতেই জানতে চাইলাম, শর্বরী কই? কেমন আছে সে?

"ভালই আছে।"—অদ্ভুত এক শুষ্ক ম্লান হাসি হেসে বলল নরেশ।

—তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হয়েছে স্যার। তার বাড়িতে নয়, সেখানে সে থাকেনা, টালিগঞ্জের একটা স্টুডিওতে।

—তারপর?

—প্রথমটা আমাকে চিনতে পারল না, মানে চিনতে চাইল না। বুঝলাম, আমি হঠাৎ ওখানে গিয়ে পড়ায় বিব্রত বোধ করছে। চোখের ইসারায় বাইরে ডেকে নিয়ে বলল, অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা ছবিতে চান্স্ পেয়েছি। এখনি আমার প্রডিউসার এসে পড়বেন। আপনাকে দেখলে হয়তো—ওঁরা সব কিছু শুনেছেন কি না।

আমি চলে আসছিলাম, ছুটতে ছুটতে এসে ধরল, আর শুনুন, আমার সেই চিঠিগুলো—

আমি আর দাঁড়ালাম না। আসতে আসতে একবার পেছন ফিরে দেখলাম, রূপে স্বাস্থ্যে, সাজ পোষাকের জলুসে ঝলমল করছে শর্বরী, কিন্তু তার দু চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে ভয়।

আমি জানতে চাইলাম, চিঠিগুলো কি করেছ?

এই মাত্তর পুড়িয়ে ফেলে এলাম।

আর একজন

বর্ধমান থেকে ট্রেনটা যখন ছাড়ে আর দুটি ভদ্রলোক ছিল সামনের বার্থে। তিন-চারটা স্টেশন পরেই কোথায় যেন নেমে গেল। ফাঁকা কম্পার্টমেণ্ট। শীতের রাতে আর কারো উঠবার সম্ভাবনা কম। বিশেষ করে ফার্স্ট ক্লাসে। দরজা দুটো লক্ করে দিলাম।

অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে সশব্দে এবং সবেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। আমি একা। একটা গোটা কামরা দখল করে বসে আছি। এর মধ্যে একটি অদ্ভুত রোমাঞ্চ আছে, নির্বাধ স্বাধীনতার এক পুলকময় উত্তেজনা।

এখন আমি যা খুশি করতে পারি। নিজের মনে একটানা বকে যেতে পারি, বেসুরো গলায় চেঁচিয়ে গান ধরতে পারি। কেউ শুনবে না। সমস্ত কামরায় বীরদর্পে পায়চারি করে বেড়াতে পারি, নাচতেও পারি, উদয়শঙ্করের অনুকরণে। কেউ দেখবে না। জানালাগুলো খুলে দিতে পারি, আলোগুলো নিভিয়ে দিতে পারি, আবার খুশিমত জ্বালিয়ে দিতে পারি। বাধা দেবার কেউ নেই। উঁচু স্প্রীংওয়ালা গদির ওপর লাফাতে পারি, ডিগবাজি খেতে পারি। আবার কিছু না করে সটান শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে মনের আনন্দে টেনে যেতে পারি।

আসলে সেদিন এর কোনটাই করলাম না, যে বার্থ-এ বসেছিলাম তারই কোণের দিকে সরে গিয়ে ব্যাগ থেকে একখানা ইংরেজী ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করলাম।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, আমি একা নই। আর একটি সহযাত্রী রয়েছে আমার কামরায়। গোড়া থেকেই ছিল, কিংবা মাঝে কোনোখান থেকে উঠেছে খেয়াল করতে পারি নি। কিন্তু সে আছে।

তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে ম্যাগাজিনে মনোনিবেশ করলাম। সে কিন্তু আমার সম্পর্কে বেশ উৎসুক বলে মনে হল। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে সোজা আমার নাকের ওপর এসে বসল।

হাত দিয়ে তাড়া দিতেই উড়ে গেল। কিন্তু বেশী দূরে গেল না। কখনো আমার মাথার ওপরে যে আলোটা তার চারধারে, কখনো বা পাশের শার্সির গায়ে, কখনো বা আমার কানের কাছ দিয়ে গুঞ্জন তুলে ঘুর্ ঘুর্ করে বেড়াতে লাগল। বেশ মজা পেয়েছে মনে হল। আমি যেন তার খেলার সাথী! ঐটুকুন একটা ক্ষীণপ্রাণ জীবের স্পর্ধা দেখে মনে মনে হেসে ফেললাম। দুটো ডানাই না হয় আছে। তার জোর আর কত! ইচ্ছে করলে এখনই আমি ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারি।

মরুকগে। ডানাওয়ালা সহযাত্রীর দিক থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে এনে সত্যি সত্যি পড়ায় মন দিলাম।

উঃ! বড্ড জ্বালালে দেখছি। একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। সেই ফাঁকে কখন পিছন দিক দিয়ে এসে ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছে। নাঃ, এই আপদটা সম্বন্ধে আর নির্বিকার থাকা চলে না। ওকে যতটা তুচ্ছ মনে করেছিলাম আসলে ও তা নয়। ও রক্ত-শোষক, ম্যালেরিয়া এবং ফাইলেরিয়ার জীবাণুবাহী, যুগ যুগ ধরে মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর পরম শত্রু। হয়তো এই মুহূর্তে আমার দেহেও ঐ রোগের বিষ ঢেলে দিয়ে গেল। ওকে উপেক্ষা করা যায় না।

তা ছাড়া আমি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছি আরামে, নির্বিবাদে, নিরুপদ্রবে যাব বলে। ও এসে অকারণে উৎপাত সৃষ্টি করছে। ওর কোন টিকিট নেই। কোনো অধিকার নেই আমার সঙ্গে এই কামরায় ভ্রমণ করবার। ওকে উৎখাত করা আমার শুধু স্বার্থ নয়, সামাজিক কর্তব্য।

ঐ, আবার এসে কাঁচের শার্সির গায়ে বসেছে। ধীরে ধীরে উঠে

পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে হাতের কাগজটা দিয়ে বসিয়ে দিলাম এক ঘা। হল না। তার আগেই পালিয়ে গেছে।

অপেক্ষা করে রইলাম, আবার কোথায় বসে দেখি। এবার ওদিকের জানালার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই উড়ে গেল! কিন্তু কতক্ষণ আর এমন করে এড়িয়ে চলবে? আজ আমার হাতে ওর মৃত্যু অবধারিত।

কেমন একটা রোখ চেপে গেল। সারা কামরা ঐ হতভাগাটার পিছনে তাড়া করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। হেরে গেলাম ওর কাছে। ভীষণ ধূর্ত। ওকে বাগে আনা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

তখন মনে হল মারতে যদি বা না পারি, তাড়িয়ে তো দিতে পারি কামরা থেকে। দুদিকের জানালাগুলো খুলে দিলাম। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সারা দেহে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। তা দিক। তবু ওটাকে তাড়াতে হবে।

আবার কাগজ নিয়ে ছুটলাম ওর পিছনে। মিনিট কয়েক পরে আর দেখতে পেলাম না। তবু কম্পার্টমেন্টের কোণগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম, কোথাও যদি লুকিয়ে বসে থাকে। না, নেই। বাঁচা গেল।

শার্সিগুলো তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সেই পুরনো জায়গাটিতে ফিরে এলাম। ঘড়ি দেখলাম, এখনো আধ ঘণ্টার উপর লাগবে হাওড়া পৌঁছতে। ম্যাগাজিনটা রেখে ব্যাগ থেকে বের করলাম শার্লক হোম্‌স্। ছোট গল্প সংগ্রহ। রেলপথে, বিশেষ করে শীতের রাতে এমন অন্তরঙ্গ উত্তপ্ত সঙ্গ আর কে দিতে পারে?

'বস্‌কম্বভ্যালী মিস্ট্রী'র গভীরে ডুবে গিয়েছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আবার সেই অবাঞ্ছিত সহযাত্রী, যাকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম, নিঃশব্দে উড়ে এসে বসল একেবারে আমার খোলা বই-এর বাঁ দিকের পাতায়। অর্থাৎ, এই রেলের কামরায় ওর আর আমার সমান অধিকার। শার্লক হোম্‌স্-এর রসাস্বাদনেও আমার চেয়ে পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়।

কিন্তু বাছাধন, এবার যে তুমি আমার হাতের মুঠোয় এসে

পড়লে। বইখানা শুধু সজোরে বন্ধ করা। ব্যস্; তারপর আর কী থাকবে তোমার? একটা কোয়ার্টার ইঞ্চি আঁকাবাঁকা কালো রেখার মত থেঁতলানো দেহ, তার পাশে একটুখানি রক্তের দাগ—যে রক্ত এই কিছুক্ষণ আগে আমারই দেহ থেকে সংগ্রহ করেছ।

বইটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম; থেমে গেলাম।

মনে পড়ল, এ আর কতটুকু রক্ত নিয়েছে আমার? এর চেয়ে অনেক অনেকগুণ শক্তিশালী বৃহৎ বৃহৎ রক্তশোষক যে নানা উপায়ে প্রতিনিয়ত আমার দেহ থেকে রাশি রাশি রক্ত শোষণ করে চলেছে, তাদের তো আমি হাতের কাছে পাচ্ছি না।

এ আর কতটুকু বিষ দিয়েছে আমার শরীরে? তার চেয়ে অনেক বেশী বিষ যে শত হস্ত থেকে আমার অস্থিমজ্জায় রক্ত ধারায় সঞ্চারিত হচ্ছে। তারাও আমার নাগালের বাইরে।

হাতের দোলা দিয়ে ওকে উড়িয়ে দিলাম।

ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ঢুকল।